সেই এক দিন আর এই এক দিন

অর্থাৎ

বঙ্গের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা।

শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

ফাল্গুন ১৭৯৭ শক।

মূল্য ৵০ পাঁচ আনা।

সেই এক দিন আর এই এক দিন

অর্থাৎ

বঙ্গের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা।

শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

ফাল্গুন ১৭৯৭ শক।

মূল্য ৷৵০ পাঁচ আনা।

বিজ্ঞাপন।

অত্রত্য কলেক্টর মহাত্মা হ্যারিশন্ সাহেবের যত্নে এখানে একটী সুরাপাননিবারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিছু দিন হইল নিয়ম হইয়াছে, সময়ে সময়ে সভায় সমাজ ও নীতিবিষয়ক প্রস্তাব পঠিত হইবে। গত ৯ই শ্রাবণ আমি তাহাতে এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছিলাম। আমার কোন কোন বন্ধু ইহা মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে আমার উপদেষ্টা ও বন্ধু বাবু রাজনারায়ণ বসুকে ইহা দেখিতে দিই। তিনি পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন, জন-সমাজে বাহির করিতে বলেন, এবং অনেক পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া দেন। তিনি দেখিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমি ইহা প্রচার করিতে সাহসী হইলাম। যদি এই প্রবন্ধ দ্বারা লোক সমাজের একটুকুও উপকার সাধন বা প্রীতি সাধন হয়, আমি কৃতার্থ হইব।

৪ ফাল্গুন ১৭৯৭ শক।
মেদিনীপুর।

শ্রী ভোলানাথ চক্রবর্ত্তি।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৯	সিংহলা	সিংহল
৬	৭	কীত্তিনাশা	কীর্ত্তিনাশা
৮	৩	তাহার	তাঁহার
ঐ	১৬	চতুষ্পা	চতুষ্পাঠী
ঐ	ঐ	চতুষ্পা	চতুষ্পাঠী
১৭	৬	গোলোক ন্যায়রত্নের	মথুরেশ ন্যায়ালঙ্কারের
ঐ	১২	ন্যায়রত্ন	ন্যায়ালঙ্কার
৩৯	২১	স্বচ্ছন্দে	সচ্ছন্দে
৪৪	২১	পোতাধক্ষ্য	পোতাধ্যক্ষ

বঙ্গের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা

আমি এই প্রবন্ধে বঙ্গের পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে মানস করি। বঙ্গের অবস্থাতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করা বাঙ্গালীর পক্ষে কৌতূহল ও ঔৎসুক্য-জনক সন্দেহ নাই।

বঙ্গের অবস্থা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ আক্ষেপ না করিয়া থাকা যায় না। এমন এক সময় ছিল, যখন বঙ্গের রাজারা পশ্চিমে ইন্দ্রপ্রস্থ, উত্তরে তিব্বত ও দক্ষিণে কর্ণাট পর্য্যন্ত আপনাদিগের রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। বঙ্গের অর্ণবপোত সকল সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, সুমাত্রা, যাবা, বালী পর্য্যন্ত গমনাগমন করিত এবং বাঙ্গালীরা সিংহল প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গের আর সে মহিমা নাই। তাহার সন্তানগণ এক্ষণে ক্ষীণ, নির্ব্বীর্য্য, নিরুৎসাহ ও শত্রুদিগের আনন্দের কারণ হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষদিগের প্রসাদে বঙ্গদেশ যে উন্নতিসোপানে পদনিক্ষেপ করিতেছে, তাহাতে ভরসা হইতেছে যে বঙ্গের মুখ পুনরায় উজ্জ্বল হইবে এবং তাহার পূর্ব্বমহিমা পুনরায় আগমন করিবে।

আমি এই প্রবন্ধে প্রথমতঃ প্রাচীন বাঙ্গালীদিগের অবস্থা বলিব এবং তৎপরে বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালীদিগের বিষয় বলিব।

সে কালের বাঙ্গালীদিগের অনেক সদ্‌গুণ ছিল। ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করিতেছি।

পূর্ব্বতন বাঙ্গালীরা অতিশয় বীর্য্যবান্ ও সাহসী ছিলেন। ইতিবৃত্তে যতদূর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার পূর্ব্বেও অনেক স্বাধীন হিন্দু রাজা এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। বেদব্যাসের সময়ের পূর্ব্বেও বঙ্গরাজ্যের

গঠন হইয়াছিল। তাঁহার প্রণীত মহাভারতে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, রাজসূয় যজ্ঞকালে মধ্যম পাণ্ডব ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং বঙ্গের রাজাদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। প্রমাণ জন্য সেই স্থল উদ্ধৃত হইল।

ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥
উভৌ বলবৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যেচ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ॥"

(বর্দ্ধমান মহারাজপ্রকাশিত মহাভারত, সভাপর্ব্ব ত্রিংশ অধ্যায়)

"তৎপরে (ভীম) মহাবল মহাবীর পুন্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছবাসী মনৌজা রাজা এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, তাম্রলিপ্ত ও কর্কটাধিপতি এই কয় জন বঙ্গদেশাধীশ্বরকে ও সুহ্মদিগের অধীশ্বর এবং সাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।" *

(কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত।)

তাম্রলিপ্ত এখানে রাজার নাম। বোধ হয় তাঁহার নাম হইতে তাম্রলিপ্ত নগরের সংজ্ঞা হইয়াছিল। অনেকে বলেন, বর্ত্তমান তমলুক-কেই লোকে পূর্ব্বে তাম্রলিপ্ত বলিত। মহাভারতে বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত শব্দের নির্দ্দেশ থাকাতে প্রতীতি হইতেছে যে মহাভারতের সময়ের পূর্ব্বেও বাঙ্গলা দেশ অধিবাসিত হইয়াছিল। আর ম্লেচ্ছ শব্দের পৃথক্ উল্লেখ

---

* কালীপ্রসন্ন বাবু মহৌজা ও কর্ব্বট শব্দের পরিবর্ত্তে মনৌজা ও কর্কট অনুবাদ করিয়াছেন।

থাকাতেই বোধ হইতেছে সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন হিন্দু রাজা। সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন এই নাম দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে উহাঁরা হিন্দু।

হিন্দুজাতির আগমনাবধি মুসলমান অধিকারের সময় পর্য্যন্ত হিন্দুরাজগণ এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহাদের রাজত্বকাল আড়াই হাজার বৎসরের ন্যূন নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেক রাজা বিপুল-বিক্রম ও দোর্দণ্ড-প্রতাপশালী ছিলেন। অনেক বঙ্গরাজ সময়ে সময়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের উপরেও আপনাদের প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। "দেবপাল, ভুপাল, মহীপাল প্রভৃতি সার্ব্বভৌম সম্রাটগণ কর্ণাট হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত দেশ সকল আপনাদের করপ্রদ করিয়াছিলেন।"

অধুনাতন বাঙ্গালিরা যেমন দুর্ব্বল ও হীনসাহস বলিয়া বিখ্যাত, পূর্ব্বতন বাঙ্গালিরা সেরূপ নির্ব্বীর্য্য ছিলেন না। পূর্ব্বোল্লিখিত সার্ব্বভৌম নরপতিদিগের বলবিক্রম ত চিরবিখ্যাত। তদ্ভিন্ন আরও অনেকের বলবীর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়সিংহ নামে এক জন বাঙ্গালী রাজকুমার পিতৃকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া লঙ্কা দ্বীপে উপনীত হন এবং বল ও পরাক্রমে উহার অধীশ্বর হন। ঐ বিজয় সিংহের নামানুসারেই লঙ্কা দ্বীপের নাম সিংহল হয়।

পূর্ব্বকালীন বাঙ্গালি জাতি এত বলিষ্ঠ হইয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের অনন্তরবংশীয়দিগের মধ্যে নিতান্ত অবনতি ও দুর্দ্দশার সময়েও অনেকের বল বিক্রমের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমি এই খানেই তাহার দুই একটী কথা বলিয়া যাই। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য জাহাঙ্গির বাদসাহকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। রায়গড়ের রাজা বসন্তরায়ের পুত্র কচুরায় জাহাঙ্গিরের প্রধান সেনানীদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। গোড় গোয়ালাদিগের ও পূর্ব্বাঞ্চলীয় চাঁড়াল জাতির বল ও সাহস কাহারই অবিদিত নাই। কিছু পূর্ব্বে এদেশে জমীদারে জমীদারে যে সর্ব্বদা দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত, ঐ গোড় গোয়ালারা ও চাঁড়ালেরা তাহাদের হইয়া লড়াই করিত। অমিত-বল আশানন্দ ঢেঁকীর কথা অনেকেরই বিদিত আছে। আশানন্দ

একবার কন্যার বিবাহের জন্য কলিকাতা হইতে কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়া বাটী যাইতেছিলেন। ডুমুরদহে রাত্রিতে দস্যুদল তাঁহাকে আক্রমণ করিল। আশানন্দ একা ও নিরস্ত্র। দস্যুরা তাঁহার শরীরে লাঠী মারিতে লাগিল। আশানন্দ একজনের হাত হইতে লাঠী কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা সকলকে গোবেড়েন ঠেঙাইতে লাগিলেন। কয়েক জন দস্যু পলাইল। আশানন্দ দুই তিন জনকে বগলে করিয়া ধরিয়া বলাগড়ের থানায় আনিয়া দিয়া চলিয়া যান। থানার লোকে তাঁহাকে এজেহার দিতে থাকিতে বলে। আশানন্দ বলেন, "এই চোর ধরে, এনে দিলাম, যা হয়, কর, আমার থাকবার অবকাশ নাই, কাল আমার কন্যার বিবাহ।" এই বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করেন। তাহাতে থানার লোকে বলপূর্ব্বক ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। আশানন্দ গোলযোগ এড়াইবার জন্য সাঁতার দিয়া গঙ্গা পার হইয়া চলিয়া যান। আশানন্দ একা জমীদারদিগের দাঙ্গা ফুরাইয়া লইতেন এবং একটী ঢেঁকি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সশস্ত্র বিপক্ষপক্ষের মধ্যস্থানে গিয়া পড়িতেন। ঢেঁকীর আঘাতে বিস্তর লোক জকম হইত। অবিলম্বে বিপক্ষীয়েরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিত। ঢেঁকি লইয়া লড়াই করিতেন বলিয়াই তাঁহার ঢেঁকী উপাধি হইয়াছিল।

মেটেরী নিবাসী রামদাস বাবুর কথাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহার শরীর প্রকাণ্ড ও বল অসাধারণ ছিল। শুনিয়াছি কোন অশ্ব তাঁহাকে বহন করিতে পারিত না। একবার অতি দুর্যোগের সময় তাঁহার মন্ত্রগুরুর গঙ্গা পার হইবার নিতান্ত প্রয়োজন হয়। কোন নাবিক সে সময় পারে যাইতে সাহস করে নাই। রামদাস বাবু গুরুদেবকে একখানি নৌকায় চাপাইয়া তীর হইতে এমনি বলে সেই নৌকা ঠেলিয়া দেন যে, তাহারই বেগে নৌকা পরপারে যাইয়া লাগে। রামদাস বাবু এমনি কৌশলে হাতীর শুঁড় ধরিয়া রাখিতেন, যে তাহাতে হস্তী কাবু হইয়া পড়িত, একপদও অগ্র পশ্চাৎ নড়িতে পারিত না। শুনিয়াছি একবার ইউরোপীয় সৈনিকদিগের নৌকা তাঁহাদের গ্রামের নিকট চাপান করে। অনেক গুলি সৈনিক তীরে নামিয়া গ্রামমধ্যে

অত্যাচার ও উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। গ্রামস্থ লোক শশব্যস্ত; কেহই তাহাদের অত্যাচার নিবারণে সমর্থ হয় নাই। রামদাস বাবু এই সংবাদ পাইয়া এক দীর্ঘ শালের খাম্বা লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে সৈনিকদিগের অভিমুখে ধাবিত হন। তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া দ্রুতবেগে লম্ফগতিতে নৌকায় পলায়ন করে।

বারাকপুরের নিকটস্থ রড়াগ্রাম-বাসী বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কেও বোধ করি অনেকে জানেন। তিনি বর্ত্তমান বর্দ্ধমান-মহারাজের পারিষদ্ ও কর্ম্মচারী ছিলেন। আমি কীর্ত্তি বাবুকে দেখিয়াছি, তাঁহার শরীর যেমন সুশ্রী, তেমনি বলবান্। তাঁহার শরীর ভীমের ন্যায় ছিল। মহারাজের আদেশে তিনি একবার দীর্ঘশৃঙ্গ বৃহৎকায় এক হরিণের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন। এক সময় রাজবাটীর একটী থাম ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয়। প্রথমে হাতী বাঁধিয়া উহা ভাঙ্গিবার উদ্যোগ হয়। কীর্ত্তিবাবু তাহা রহিত করিয়া নিজে তা-হাতে প্রবৃত্ত হন। থামে কাছী বাঁধিয়া তাহার অপর প্রান্ত আপন কোমরে বাঁধেন ও বার কতক জোরে হেঁচকা টান দিয়া থাম ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

আরও কয়েকজন বলবান্ লোকের কথা শুনিয়াছি, তাঁহারা নারিকেল গাছে এমন বলে তাল মারিতেন যে তাহাতে নারিকেল পড়িয়া যাইত।

আমি উপরে যে সকল বলের উদাহরণ বলিলাম, এক্ষণে অনেকে উহা অলীক ও উপন্যাস বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু ঐ সকল বাস্তবিক সত্য। এবং অনেকেই উহার সত্যতা অবগত আছেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালি জাতির মধ্যে উক্তরূপ বলবীর্য্যের উদাহরণ অতি সাধারণ ছিল।

আমি কথাপ্রসঙ্গে বক্তৃতার ক্রম-সূত্র পরিত্যাগ করিয়া অনেক নীচে আসিয়া পড়িয়াছি। সভ্যমহাশয়দিগকে প্রাচীন বাঙ্গালিদিগের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিতে দিতে প্রায় আধুনিক বঙ্গবাসীদিগের নিকট আনিয়া ফেলিয়াছি। চলুন পুনরায় পূর্ব্বতন পুরুষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করি।

প্রাচীন বাঙ্গালিদিগের হর্ম্ম্যনির্ম্মাণ-প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ছিল। এখনও অনেক স্থানে প্রাচীন বাটী ও দেবমন্দিরের গঠন দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। পূর্ব্বে যেরূপে গাথনীর মশলা প্রস্তুত হইত, এক্ষণে লোকে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। বহুশত বৎসর অতীত হইয়াছে, ঐরূপ বাটীর গাঁথনীর যোড় অত্রুটিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার যোড় খসাইবার বিবিধ চেষ্টা কর, ইট গুঁড়া হইয়া যাইবে, যোড় কোন ক্রমেই খসিবে না। প্রাচীন গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষ, কীর্ত্তিনাশা নদীতীরস্থ রাজা রাজবল্লভের বাটীর অবশিষ্টাংশ, গড়মান্দারণের ভগ্না-বশেষ ও সুন্দর বনের প্রোথিত গৃহাদি প্রাচীন বাঙ্গালি জাতির হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণ-প্রণালীর উৎকর্ষের দেদীপ্যমান প্রমাণ।

ঢাকার মস্‌লিন বস্ত্র পূর্ব্বকালে রোমদেশে অতি সমাদরে গৃহীত হইত। আবার একটু ক্রমরেখা পরিত্যাগ করিতেছি। অদ্যাপি ঢাকাই কাপড় ও ঢাকাই কারিকরদিগের গঠিত অলঙ্কার বাঙ্গালি জাতির শিল্পনৈপুণ্যের চূড়ান্ত সীমা। মুরশিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের তসর ও গরদ, শান্তিপুর, লালবাগান, বরাহনগর, কলমে, খরসরাই প্রভৃতি স্থানের কার্পাসবস্ত্র, মেদিনীপুরের মছলন্দ এবং থাকড়া, বিষ্ণুপুর কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের পিতল কাঁসার বাসন বাঙ্গালি জাতির শিল্পপটুতার বিশেষ পরিচায়ক। মেদিনীপুরের মছলন্দ, নদিয়ার কারিক-রদিগের গঠিত কৃষ্ণনগর বাজারের প্রতিমূর্ত্তি এবং ঢাকাই কারিকরদিগের তারে নির্ম্মিত অলঙ্কার লণ্ডন ও পারিস-শিল্প-প্রদর্শনে প্রেরিত হইয়া-ছিল। ঐ সকল বস্তুর জন্য উত্তম পুরস্কার আসিয়াছিল।

প্রাচীন বঙ্গনিবাসী হিন্দুরা সমুদ্রে গমনাগমন পূর্ব্বক সিংহল, যাবা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে বাণিজ্য করিতেন। চাঁদ, ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রভৃতি সওদাগরেরা সমুদ্রপোতে আরোহণ করিয়া বাণিজ্য করিতেন। তৎকালীন হিন্দুদিগকে সমুদ্র ও বিদেশে গমন জন্য জাতি-ভ্রষ্ট ও অপাঙ্‌ক্তেয় হইতে হইত না।

কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে প্রাচীন বাঙ্গালিদিগের উৎকর্ষের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বোধ করি তদ্বিষয়ে এখনও যেমন অবস্থা, পূর্ব্বেও

তদনুরূপ ছিল। এদেশে কৃষি বিষয়ে উন্নতির তত প্রয়োজনও হইত না। চিরকালই দেশ উর্ব্বর। জননী বঙ্গভূমি আপন সন্তানদিগকে অকাতরে অপরিমিত শস্য দিয়া পোষণ করিতেন। ফলতঃ মৃত্তিকার অসাধারণ উর্ব্বরতা গুণে অপর্য্যাপ্ত শস্যরাশি সমুৎপন্ন হইত। কৃষি-কার্য্যের উন্নতির অপেক্ষা থাকিত না।

পূর্ব্বকাল হইতেই বাঙ্গালি জাতির শ্রমবিভাগের সুব্যবস্থা হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বা শ্রেণীর উপর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যনির্ব্বাহের ভার নির্দ্ধারিত ছিল। তদ্দ্বারা পরস্পরের শ্রমবিনিময়ে বঙ্গসমাজের সাধারণ অভাব ও প্রয়োজনের পূরণ হইয়া সুখসচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইত।

পুরাকালে বঙ্গদেশে জ্ঞান ও বিদ্যার বিলক্ষণ চর্চ্চা হইত। বল্লাল-কৃত বিভাগানুসারে যদি মিথিলাকে বঙ্গদেশের মধ্যে ধরা যায়, তাহা হইলে, বাঙ্গালায় জ্ঞানচর্চ্চার একশেষ হইয়াছে বলিতে হইবে। মিথিলা দর্শনশাস্ত্রের ও তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলনের প্রধান স্থান। এই স্থানে ন্যায়মতপ্রবর্ত্তক গৌতমের এক আশ্রম ছিল। এই স্থলেই ন্যায়-দর্শন উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। এই খানেই পরম জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী জনক রাজা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই স্থানেই যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনক রাজার নিকটে আগমন করিয়া তত্ত্ববাদ-সংশয় ভঞ্জন করিয়াছিলেন। এই মিথিলা দেশেই বিখ্যাত ন্যায়টীকাকার পক্ষিল স্বামী জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের আদি কবি বিদ্যাপতি মিথিলানিবাসী ছিলেন।

প্রকৃত বাঙ্গলা দেশেও বহুল জ্ঞানচর্চ্চা হয়। পূর্ব্বে নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে ছাত্রবর্গ মিথিলায় ন্যায় বেদান্ত প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। মৈথিল অধ্যাপকগণ এদেশীয় ছাত্রদিগকে গৃহ প্রত্যাগমনকালে ন্যায়দর্শনের পুস্তক অর্পণ করিতেন না। পুস্তক পাইলে আর এ অঞ্চলের কেহ তাঁহাদের নিকট অধ্যয়ন করিতে যাইবে না। সুতরাং তাঁহাদের আর তাদৃশ গৌরব থাকিবে না। অতুল্যমেধাবী বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং শুদ্ধ তাঁহার চিত্তস্থিত স্মরণাদর্শ লক্ষ্য করিয়া অপার সাগরসদৃশ

অতিবৃহৎ ন্যায়দর্শনের আদ্যোপান্ত পুস্তক লিখিয়া ফেলেন। এবং নবদ্বীপে তাহার অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। নব্যস্মৃতিকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি, ও চৈতন্য দেব তাহার ছাত্র ছিলেন। শিরোমণি মিথিলায় গমন করিয়া পক্ষধর মিশ্রকে বিচারে পরাভূত করিয়া আইসেন।

নবদ্বীপ কাশী, পুনা প্রভৃতি স্থানের ন্যায় সংস্কৃতচর্চ্চার প্রধান স্থান হইয়া উঠে। এই স্থানে আরও অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রামভদ্র সার্ব্বভৌম, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর শিরোমণি প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সকল এই স্থানে আবির্ভূত হইয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি নবদ্বীপের পূর্ব্বগরিমা অবিলুপ্ত আছে। সরস্বতী দেবী তাঁহার চিরবিরাম-স্থল নবদ্বীপ আজ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

কেবল নবদ্বীপ নহে, ত্রিবেণী, বাঁশবেড়ে, বিষ্ণুপুর, খানাকুল কৃষ্ণনগর, ভাটপাড়া প্রভৃতি বঙ্গদেশের অনেক স্থান সংস্কৃতচর্চ্চার জন্য বিশেষ বিখ্যাত। বঙ্গদেশের প্রায় প্রতি গ্রামে দুই তিন খানি করিয়া চতুষ্পা ছিল। এখনও এদেশে বহুসংখ্য চতুষ্পা বিদ্যমান আছে। অদ্যাপি অনেক ব্যুৎপন্ন শাস্ত্রী ও দার্শনিক পণ্ডিত আছেন।

পূর্ব্বে এদেশে রাজা, জমীদার ও ধন্যাঢ্যদিগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সভাসদ লইয়া শাস্ত্রানুশীলন করাই নিত্য আমোদ ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা, বিক্রমাদিত্যের সভার ন্যায়, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, শরণ তর্কালঙ্কার, অনুকূল বাচস্পতি প্রভৃতি পঞ্চরত্নে মণ্ডিত ছিল। তদ্ভিন্ন ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি বাঙ্গালা-কবিগণ তাঁহার সভার অলঙ্কার ছিলেন।

তৎকালে রাজা জমীদার প্রভৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিরা বিদ্যার বিশেষ সমাদর করিতেন। এবং বিদ্যাব্যবসায়ীদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। তাঁহারা অনেক নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সাহায্য করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। অদ্যাপি সে রীতি অব্যাহত আছে।

প্রাচীন অধ্যাপকগণ অর্থলোভশূন্য ছিলেন। কাশীর এক জন

অধ্যাপক আসিয়া রাজা নবকৃষ্ণের সকল সভাসদ্ পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করেন। তাহার পর বুনো রামনাথ যাইয়া বেদান্তের বিচারে তাঁহাকে পরাজিত করেন। রাজা রামনাথকে বিপুল অর্থ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু ধন অধ্যয়নের প্রতিপক্ষ বলিয়া তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে কেবল শাস্ত্রের অনুশীলন মাত্র হইত তাহা নহে। এখানে অনেক মূলগ্রন্থ ও অনেক গ্রন্থের টীকা সকল বিরচিত হইয়াছে। দর্শন, স্মৃতি, চিকিৎসা প্রভৃতি বহুবিষয়ে বিস্তর মূলগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। কয়েকখানী অতি উৎকৃষ্ট কাব্যও সঙ্কলিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণির লিখিত চিন্তামণিদীধিতি নামে ন্যায়দর্শনের মহতী টীকা মূল গ্রন্থমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ব্যুৎপত্তিবাদ ও লীলাবতী নামে আর দুই খানি গ্রন্থ তাঁহার-লেখনীপ্রসূত। প্রসিদ্ধ গদাধর ভট্টাচার্য্য, শিরোমণির গ্রন্থ সমুদায়ের টীকা করেন। জগদীশ ভট্টাচার্য্য শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ও ব্যাকরণের টীকা লেখেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অন্যতম ছাত্র রঘুনন্দন স্মার্ত্তবাগীশ নব্য স্মৃতি সঙ্কলন করেন। অদ্যাপি হিন্দুসমাজ সেই স্মৃতিশাস্ত্রের শাসনের অধীন।

বঙ্গদেশবাসী বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণ নামে অলঙ্কার শাস্ত্র বিরচন করেন। তাহা প্রধান আলঙ্কারিক গ্রন্থমধ্যে পরিগণিত। এক্ষণে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য দর্পণেরই অধ্যাপনা হইয়া থাকে।

বীরভূমের অন্তর্গত ময়ূরেশ্বরবাসী মাধব কর রোগনিদান, দত্তক-চন্দ্রিকা, রসকৌমুদী, রসদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ সকল রচনা করেন। এক্ষণে মাধব করের নিদান এ দেশের সকল বৈদ্যই কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন। তাঁহার জামাতা বিজয় রক্ষিত ঐ নিদানের টীকা করেন। ঐ টীকা অতি আদরণীয়া। ঐ ময়ূরেশ্বরবাসী চক্রপাণিদত্ত চক্রদত্ত নামে চিকিৎসা গ্রন্থ এবং মাঘ, কাদম্বরী ও ন্যায় শাস্ত্রের টীকা লেখেন। বর্দ্ধমানান্তর্গত পাতিলপাড়া-নিবাসী ভরতমল্লিক মেঘদূত, অমরকোষ, ভট্টিকাব্য, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি বহু গ্রন্থের টীকা করেন।

ভরত মল্লিকের টীকার উপর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগের সমধিক শ্রদ্ধা আছে। বোপদেবরচিত মুগ্ধবোধ, ক্রমদীশ্বরকৃত সঙ্ক্ষিপ্তসার প্রভৃতি যে কয়েক খানি সংস্কৃত ব্যাকরণ এ দেশে প্রাচীন কাল হইতে অধ্যাপিত হইয়া আসিতেছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে তাহাদের নাম গন্ধও নাই। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, এ গুলি বঙ্গদেশেরই সম্পত্তি।

অজয় নদের তীরস্থিত কেন্দুবিল্বাসী জয়দেব গোস্বামী কান্তকোমল-পদাবলিপরিপূরিত গীতগোবিন্দ রচনা করেন। আদিশূরের আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার প্রণয়ন করেন। কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ নৈষধচরিতের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু এক্ষণে সপ্রমাণীকৃত হইয়াছে, উহা ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম শ্রীহর্ষ-প্রণীত।

চৈতন্যের শিষ্যসম্প্রদায় হইতেও অনেক গুলি সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালিরা যে উত্তম উত্তম সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইলে তদ্ভাষাতেও অনেক প্রাচীন বাঙ্গালি গ্রন্থকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জীবগোস্বামী, বৃন্দাবনদাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস, কাশীদাস, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গকবিদিগের নাম ও গ্রন্থ অনেকে অবগত আছেন।

আমি এক্ষণে একটী ভিন্নপ্রকৃতি বাঙ্গালি লেখকের নাম উল্লেখ করিব। এই লেখক বঙ্গীয় সমাজের কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমি গণিতজ্ঞ শুভঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছি। শুভঙ্কর গণিত বিষয়ে কতকগুলি আর্য্যা অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ নিয়ম রচনা করিয়াছেন। ঐ আর্য্যাগুলিতে অঙ্ক কষিবার অতি সরল ও সহজ প্রণালীর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সাংসারিক প্রয়োজনীয় সমস্ত অঙ্কই শুভঙ্করী আর্য্যা দ্বারা মুখে মুখে কষা যায়। এক জন সামান্য কৃষকও আর্য্যা দ্বারা মুখে মুখে ক্ষেত্রের কালী ঠিক করিতে পারে। পুষ্করিণীকালী,

বাঙ্গালি স্ত্রী ও সুশিক্ষিতা ছিলেন।)

(বর্দ্ধমান রাজকুমারী বিদ্যা বিদ্যাবতী ছিলেন। তিনি অনেক অধ্যাপককে বিচারে পরাস্ত করিয়া ছিলেন। কেহ কেহ বলেন বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান সত্য নহে, কল্পিত। তাহা হইলেও সপ্রমাণ হইতেছে বাঙ্গালি স্ত্রীরা শিক্ষালাভে বঞ্চিত ছিলেন না। কারণ তৎকালে স্ত্রীশিক্ষা-প্রথা না থাকিলে, কবি কখনই তাঁহার কাব্যের নায়িকাকে শিক্ষিতা বলিয়া চিত্রিতা করিতেন না।)

শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবু বলেন, "হঠী বিদ্যালঙ্কার একজন বিদ্যা-

এ কথার অর্থ নাই। খনা বিক্রমাদিত্য-সভাসদ্ বরাহের পুত্র মিহিরের পত্নী, এ কথা উন্মত্তপ্রলাপ। কারণ বরাহ ও মিহির স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহে। বরাহমিহির এক ব্যক্তি। সুতরাং খনার প্রকৃত জন্ম স্থান কোথায়, তাহার নির্ণয় হয় না। তাঁহার রচিত বাঙ্গালা জ্যোতিষিক বচন গুলি দ্বারা বলা যাইতে পারে, খনা বাঙ্গালি। ঐ বচন কাহারও অনুবাদ হইলে, অবশ্য তাহার মূল থাকিত। আর উহার রচনা দেখিয়া বোধ হয় উহা কাহারও অনুবাদ নহে, মূল।

কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা, এলোমেলো বয় বা।
কি কর শ্বশুর বাঁধ গে আল, আজ না হয় হবে কাল॥ ১॥
যে যে মাসের যে যে রাশি, তার সপ্তমে থাকে শশী।
সে দিনে হয় পৌর্ণমাসী, অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী॥
দুই তিন পাঁচ ছয়, একাদশে দেখ্তে হয়॥ ২॥
আপনার জন্ম নক্ষত্র মাসের যতদিন, তিথিবার ঐক্য করে সাতে কর হীন।
একে শুভ, দুয়ে ভাল, তিনে শত্রুক্ষয়, চতুর্থেতে কার্য্য সিদ্ধি পঞ্চমে সংশয়।
ষষ্ঠে মৃত্যু, শূন্য হলে পায় বহু সুখ, খোনা বলে এ যাত্রায় কভু নাহি দুখ॥ ৩॥

এরূপ রচনা কি কখন অনুবাদ বলিয়া বোধ হইতে পারে? অনুবাদের কথাও কেহ বলে না। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, খনা বাঙ্গালি স্ত্রী ও সুশিক্ষিতা ছিলেন।)

(বর্দ্ধমান রাজকুমারী বিদ্যা বিদ্যাবতী ছিলেন। তিনি অনেক অধ্যাপককে বিচারে পরাস্ত করিয়া ছিলেন। কেহ কেহ বলেন বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান সত্য নহে, কল্পিত। তাহা হইলেও সপ্রমাণ হইতেছে বাঙ্গালি স্ত্রীরা শিক্ষালাভে বঞ্চিত ছিলেন না। কারণ তৎকালে স্ত্রীশিক্ষাপ্রথা না থাকিলে, কবি কখনই তাঁহার কাব্যের নায়িকাকে শিক্ষিতা বলিয়া চিত্রিতা করিতেন না।)

শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবু বলেন, "হঠী বিদ্যালঙ্কার একজন বিদ্যা-

বতী বাঙ্গালি ব্রাহ্মণকন্যা। ইহাঁর জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার সোঞাই গ্রাম। ইনি বৈধব্য অবস্থায় বৃদ্ধবয়সে কাশীতে টোল করিয়া সভায় ন্যায় শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষ ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় বিদায় লইতেন।")

(কেহ কেহ বলেন রাজসাহী জেলার বিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণা রাণী ভবানী লেখা পড়া জানিতেন।

এই দুই একটী উদাহরণ দ্বারা বিশ্বাস হইতেছে যে পূর্ব্বে বঙ্গরমণীগণ শিক্ষালাভে বঞ্চিত ছিলেন না। কেনই বা তাহা হইবে। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রই ত প্রাচীন বাঙ্গালিদিগের নেতা ছিল। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে,

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

বোধ হয়, যবনাধিকার কালে যখন বঙ্গনারীদিগের রূপ গুণ মহা অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় হইতেই তাহাদের শিক্ষার বিঘ্ন ঘটিয়াছে। উক্ত কারণেই বোধ হয়, বোধ হয় কেন নিশ্চয়, স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে নিরুদ্ধ রাখার ও বালিকা বিবাহ প্রচলনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।)

(প্রাচীন বাঙ্গালি রমণীরা ফুলবাবু ছিলেন না। তাঁহারা গৃহকার্য্যে দাসদাসীর উপর নির্ভর না করিয়া আপনারাই অনেক কার্য্য করিতেন। তাঁহারা পাকশাকে অতিনিপুণ ছিলেন। বড় বড় যজ্ঞি জালায় বঙ্গরমণীরা নিজে পাক করিতেন। এক এক জন স্ত্রীলোকে এক একটী বৃহৎ যজ্ঞের প্রায় সমস্ত পাক একা নির্ব্বাহ করিতেন। যজ্ঞিতে রসুই করিতে তাঁহাদের আমোদ কত। ইহা তাঁহারা সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেন যে, দশ জন কুটুম্ব আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে এবং পাকের প্রশংসা করিবে। এক এক জন, যজ্ঞিতে রসুই করিতে না পাইলে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইতেন। ঐ সকল পাকে তাঁহাদের যত্ন ও ভক্তিই বা কত। প্রাতঃস্নান করিয়া শুচি ও পবিত্র হইয়া রসুইশালে ঢুকিতেন। এবং যত কেন বেলা হউক না, যে পর্য্যন্ত না কুটুম্ব সজ্জন ভোজন করিতেন, ততক্ষণ তাঁহারা জলস্পর্শ করিতেন না। অনাহারে পাক করিতে হইবে এরূপ নিয়ম নহে, কিন্তু শ্রদ্ধা ও ভক্তি বশতঃ প্রায়ই সকলে এইরূপ করিতেন।)

প্রাচীন বাঙ্গালি স্ত্রীলোকদিগের অত্যন্ত ঔদার্য্য ও নিঃস্বার্থ ভাব ছিল। তাঁহারা পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের জন্য লালায়িত ছিলেন না। স্বামী নানাবিধ ক্রিয়া কলাপ, দশ জন লোককে অন্নদান, এবং বিদ্যা ও সদ্‌গুণ দ্বারা লোকসমাজে মান্য গণ্য হইলেই তাঁহারা কৃতার্থ হইতেন। এবিষয়ের একটী সুন্দর উদাহরণ আছে।

এক দিন নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গোলোক ন্যায়রত্নের পত্নী খিড়কীর পুকুরে বাসন মাজিতে গিয়াছিলেন। প্রতিবেশ-বাসিনী আর আর সম্ভ্রান্ত মহিলারাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। ধন্যাঢ্য পত্নীরা বিবিধ অলঙ্কারে ভুষিতা। ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী নিরলঙ্কৃতা। অপরাপর রমণীরা অলঙ্কারের গর্ব্বের সহিত ভট্টাচার্য্যপত্নীকে বলিলেন, " হ্যাঁগা ঠাকৃরুণ! ভট্‌চায্যি মশায় ত খুব মোটা মোটা বিদায় পান, তাঁর ত অনেক টাকা আছে। তিনি তোমাকে কিছু গহনা টহনা দেন না কেন?" ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পত্নী আপনার বাম হস্ত তুলিয়া সাহঙ্কারে বলিলেন, " দেখ্‌, তোরা কি সোণাদানার গর্ব্ব করিস্‌? আমার হাতে এই লোহার খাড়ু যতদিন আছে, ততদিন নবদ্বীপের এয়োত আছে! তোদের ও ঝুড়ি ঝুড়ি গহনাতেও নবদ্বীপের একটুকুও শোভা হয় না!" আহা! ঐ স্ত্রীলোকটীর মন কি উন্নত ছিল। দেশমান্য পণ্ডিত স্বামীই যে তাঁহার উজ্জ্বলতর ও শ্রেষ্ঠতর ভুষণ, ইহা তিনি সুন্দর বুঝিয়া ছিলেন। যে সকল স্ত্রীলোকে এরূপ ভাব অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারা অল্প প্রশংসনীয় নহেন।

প্রাচীন বঙ্গকামিনীরা নিজে সন্তান প্রতিপালন ও সাংসারিক কার্য্য সমুদায়ের ভার গ্রহণ করিতেন। শিশুদিগের পীড়ায় তাঁহারা নিজেই অনেক চিকিৎসা করিতেন। প্রাচীন গৃহিণীরা বাল-চিকিৎসার উত্তম উত্তম ঔষধ জানিতেন। তাঁহারা আত্মীয় স্বজনের পীড়িত অবস্থায় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্ব্বদা সেবা শুশ্রূষা করিতেন। তৎকালে তাঁহারা নিজের আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর সুখ ও সচ্ছন্দতা বিধান করিতেন।

তাঁহারা স্বামীকে ধর্ম্মক্রিয়ায় উৎসাহিত করিতেন। ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহাদের বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। অনেক সময় তাঁহারা নিজের স্বার্থ ত্যাগ

করিয়া বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্ম কর্ম্মের সমধিক গৌরব করিতেন। রাজা রামকান্ত ছাব্বিশ হাজার টাকা মূল্যের দুই ছড়া মতির মালা ক্রয় করিয়া এক ছড়া জয়কালী দেবীকে ও এক ছড়া পত্নী রাণী ভবানীকে দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। এক ছড়া একটু উত্তম ছিল। অপর ছড়া কিছু নিকৃষ্ট। রাণীকে কোন্ ছড়া লইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অপকৃষ্ট ছড়াটী লইতে চাহিলেন। রাজা বলিলেন, "আমি তোমাকে ভাল ছড়াটী দিব মনে করিয়াছিলাম।" রাণী বলিলেন, "তবে তোমার ও আমার উভয়েরই মানস পূর্ণ হউক, দুই ছড়াই দেবীকে দেও।" তদনুসারে দুই ছড়া মালাই দেবীকে দেওয়া হয়।

আমি এপর্য্যন্ত বাঙ্গালি স্ত্রীদিগের সতীত্বের কথা উল্লেখ করি নাই। যদি বঙ্গ-রমণীদিগের বলিবার যোগ্য কোন গুণ থাকে, তবে সে কেবল এক সতীত্ব। যদি আমি এ বিষয়ে কিছু না বলিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করিতাম, তাহা হইলে আমি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণজনিত বিশেষ প্রত্যবায়ভাগী হইতাম। আবহমান কাল হইতে বাঙ্গালি স্ত্রীদিগের পাতিব্রত্য চিরবিখ্যাত। এদেশে সতীত্বের লক্ষণ অতি উচ্চ ভাব-সম্পন্ন। আজীবন এক মাত্র স্বামীর উপর ভক্তি প্রীতি দৃঢ় ও অবিচলিত রাখাই এদেশে সতীত্বের প্রধান লক্ষণ। মনে মনেও পুরুষান্তর কামনা করিলে পাতিব্রত্যভঙ্গ হয়। যুক্তি অনুসারে সতীত্বের লক্ষণ যেরূপই হউক না কেন, এদেশের সতীত্বের লক্ষণ যে অত্যন্ত উদার ও মহদ্ভাবে পরিপূর্ণ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এদেশের কি সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক, কি সামান্য অবস্থার স্ত্রীলোক, সকলেরই মনে সতীত্বের ঐরূপ ভাব চির বিরাজ করে। এদেশীয় স্ত্রীরা পাতিব্রত্যের বহুল সমাদর ও গৌরব করিয়া থাকেন। সতীত্ব ঐহিক পারত্রিক সুখের একমাত্র নিদান বলিয়া সকল রমণীই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। বহু প্রলোভনেও বঙ্গ রমণীরা সতীত্ব বিসর্জ্জন দিতে সম্মত নহে। সময়ে সময়ে ইঁহারা সতীত্ব রক্ষার জন্য অকাতরে জীবন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

ইতিহাসে সকলেই পাঠ করিয়া থাকিবেন, বরদা পরগণার জমীদার

সুবা সিং বর্দ্ধমান রাজবাটী আক্রমণ ও রাজাকে হত্যা করিয়া অন্যান্য লোঠিত দ্রব্যের মধ্যে এক পরমাসুন্দরী যুবতী কুমারী প্রাপ্ত হয়। সুবা সিং ঐ যুবতীকে শয়নাগারে আনয়ন করিয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে না করিতেই ঐ স্ত্রী আপন বস্ত্রমধ্যে গোপিত এক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বাহির করিয়া সুবা সিঙের হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেন এবং পরক্ষণেই সেই অস্ত্র দ্বারা আত্ম হত্যা করেন।)

সকলেই জানেন ঐ বর্দ্ধমান হইতে ভিন্নজাতীয়া এক স্ত্রী সাম্রাজ্যের লোভে আপন স্বামিহন্তাকে অক্ষুব্ধ চিত্তে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, একজন হিন্দু বাঙ্গালি স্ত্রী, ঐ অবস্থায় পড়িলে, সাম্রাজ্যের সহিত আপন সতীত্বের কখনই বিনিময় করিতেন না।

একদা কৃষ্ণনগর জিলায় এক ব্যক্তি আপনার স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয় হইতে লইয়া যাইতেছিল। স্বামী চলিয়া যাইতেছিল। পত্নী ডুলিতে ছিল। ডুলি এক নীল কুঠির নিকট উপস্থিত হইলে কুঠির সাহেব বলপূর্ব্বক ডুলি শুদ্ধ স্ত্রীলোকেটীকে আপন কুঠির ভিতর লইয়া যায়। তাহার স্বামীকে কুঠির ভিতর ঢুকিতে দিল না। সাহেব স্ত্রীলোকটীকে এক নির্জন গৃহে লইয়া গিয়া তাহার উপর পশুবৎ নিষ্ঠুর অত্যাচারের উপক্রম করে। স্ত্রীলোকটী অনেক কাকুতি বিনতি ও কাঁদা কাটী করিল। কিন্তু যখন দেখিল সকলই বিফল হইল, সতীত্ব ও জাতি রক্ষার আর কোন উপায় নাই, তখন কপট সম্মত হইয়া বলিল, "দেখ, সমস্ত দিন আজ আমার কিছু আহার হয় নাই, বড় কষ্ট হয়েচে, আগে আমায় কিছু খাইতে দেও।" তখন সাহেব ব্যগ্র ভাবে কি খাইবে জিজ্ঞাসা করায়, ঐ স্ত্রীলোকটী বলিল, "তোমাদের ছোঁয়া অন্য কিছু খাব না। যদি আস্ত ফল মুল কিছু দিতে পার তা হলে আমি নিজে ছাড়্যে খেতে পারি।" তাহাতে পেঁপে ও আর কি কি ফল দেওয়া হইয়াছিল। ছাড়াইবার জন্য এক খানী অস্ত্র দেওয়া হয়। ঐ সাধ্বী স্ত্রী সেই অস্ত্র অকাতরে আপন গলায় বসাইয়া দেয়, এদিকে তাহার স্বামী পুলিসে সংবাদ দেয়, পুলিস আসিবার পূর্ব্বেই স্ত্রীলোকটীকে, অল্প জীবিত থাকিতে থাকিতেই, পুতিয়া ফেলা হইয়াছিল।)(এক

সময় বৈদ্যবাটীর নিকটে এক দুরাচার জমীদারের অত্যাচারে ঠিক ঐরূপ একটী ঘটনা হইয়াছিল। সতীত্ব রক্ষার জন্য এ দেশীয় রমণীরা যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তাহার ভুরি ভুরি নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্যভিচার দোষ এদেশে নিতান্ত বিরল। যদি বিধবার দল, বহুসপত্নীক কুলীন কন্যাগণ ও অশীতিপর বৃদ্ধপতির যুবতী ভার্য্যা সকল বাদ দেওয়া যায়, এ দেশে ভদ্র পরিবার মধ্যে ব্যভিচার দোষ আদবেই নাই একথা বলা যাইতে পারে।)

ফলতঃ প্রাচীন বাঙ্গালিরা অন্যান্য দেশীয় হিন্দুদিগের ন্যায় সকল বিষয়েই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

আমি এক্ষণে বঙ্গের অধুনাতন অবস্থা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বঙ্গের বর্ত্তমান উন্নতির প্রধান কারণ আমাদিগের দেশে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের শুভাগমন। আমি উপরে বঙ্গের যে পূর্ব্বোৎকর্ষের কথা বলিলাম, তাহা অধিক পরিমাণে মুসলমানদিগের রাজত্বসময়-সম্বন্ধীয়। তাহা সেই অবনতির সময়ের উৎকর্ষ। হিন্দু রাজাদিগের সময় উহার অবস্থা কিরূপ উৎকৃষ্ট ছিল তাহা বলা যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে তাহার কোন ঐতিহাসিক বিবরণ নাই।

যে দিন যবনের উষ্ণীষ বঙ্গ রাজ্যে প্রবেশ করে, সেই দিন হইতেই এদেশের দুর্ভাগ্য ও অবনতির সূত্রপাত হয়। নিষ্ঠুর যবনশাসনে এদেশ ক্রমশঃ উৎসন্ন হইয়া যায়। যেমন এক প্রবল বাত্যা আসিয়া বন উপবন ভগ্ন ও হতশ্রী করে, সেই রূপ নৃশংস দুরাচার যবন জাতি আসিয়া আমাদের জন্মভুমি বঙ্গভূমির সমুদায় সুখসৌভাগ্য বিনষ্ট করিয়াছিল। অজস্র অত্যাচার স্রোত সহ্য করিয়া—নিরন্তর নিপীড়িত হইয়া বঙ্গ সন্তানেরা নিতান্ত নির্ব্বীর্য্য ও হীনসাহস হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম বিকৃত ভাব ধারণ করে। স্ত্রীশিক্ষা একেবারে রহিত হয়। যবনাক্রমণ নিবারণ জন্য স্ত্রীজাতিকে নিভৃত নির্জন গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইতে লাগিল। এক সময় দেশের এমনি দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, যে, ধনীর ধন, মানীর মান ও সতীর সতীত্ব সমূহ বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

সকল বিষয়েরই সীমা আছে। যখন মুসলমানদিগের অত্যাচার

নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন জগদীশ্বর তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় বিধান করিলেন। শতাধিক বৎসর অতীত হইল, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা মহেন্দ্র নারায়ণ, জগৎ শেঠেরা, উমীচাঁদ প্রভৃতি তদানীন্তন প্রধান প্রধান কয়েক ব্যক্তি দেশের অতীব দুরবস্থা দর্শনে যার পর নাই ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়া,কি উপায়ে যবন অত্যাচারের নিবারণ হইতে পারে, তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বণিক্-বেশে আগত সুসভ্য ইংরাজ জাতির হস্তে শাসনভার অর্পণ করাই শ্রেয়ঃ স্থির করিলেন। এবং অবিলম্বে বঙ্গরাজ্যের রাজপদে সুনীতি-সম্পন্ন ইংরাজ জাতিকে বরণ করিলেন। তদবধি এদেশ ইংরাজ রাজার অধীন হইয়াছে। ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট ক্রমে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়াছেন।

যে দিন এদেশে ব্রিটিশ পতাকা প্রথম উড্ডীন হয়, সেই দিন হইতেই এদেশের পুনঃসৌভাগ্যের সূত্রপাত হইয়াছে। বলুন দেখি, যদি এপর্য্যন্ত যবনাধিকার অব্যাহত থাকিত, তবে আজ দেশের কি দশা ঘটিত? অতএব একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে পরমেশ্বর মঙ্গলের জন্য ইংরাজ জাতিকে এদেশে আনয়ন করিয়াছেন।

ব্রিটিশ অধিকারে যবনদিগের অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে। দেশ পুনরায় উন্নতির দিকে ধাবমান হইয়াছে। বহুলরূপে জ্ঞানানুশীলন ও বিদ্যাচর্চ্চা আরব্ধ হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্মোন্নতিসাধন ও সমাজসংস্করণ উপক্রান্ত হইয়াছে। বিবিধ উচ্চপদ প্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হইতেছে।

ব্রিটিশ অধিকারে যে যে বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে।

রাজশাসন সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমার অধিকারবহির্ভূত। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যবনশাসনের সহিত ব্রিটিশ শাসনের তুলনাই হইতে পারে না। অন্ধকার ও আলোকে যত অন্তর, দুঃখ ও সুখে যত প্রভেদ, যবন শাসন ও ব্রিটিশ শাসনে তদপেক্ষাও অধিক প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। এক্ষণে কাহারই ধনজীবন বিনা কারণে সংশয়িত অবস্থায়

নিপতিত হয় না। এখন দেশের সকল স্থানেই সুশাসন ও সুবিচার বিতরিত হইতেছে। এখন আর দুর্ব্বলকে প্রবলের পীড়ন সহ্য করিতে হয় না। এক্ষণে প্রায়ই কেহ অন্যায় ও অত্যাচার করিয়া দণ্ড এড়াইতে পারে না। এখন আমরা স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতে পারি। বৃটিশগবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে অনেক বিষয়ে স্বত্বাধিকারী করিয়াছেন। সত্য বটে অদ্যাপি কোন কোন বিষয়ে আমাদের প্রার্থনা ও আশা পূর্ণ হইতেছে না। কিন্তু আশা করা যায়, ঈশ্বরের অনুগ্রহে কালে আমাদের সে সকল অভাবের পূরণ হইবে।

বৃটিশ অধিকারে এ দেশের লোকের কুসংস্কার ও অজ্ঞানমূলক কয়েকটি বিশেষ অনিষ্টকর প্রথা নিবারিত হইয়াছে। সহমরণ ও গঙ্গা-সাগরে জীবিত সন্তান নিক্ষেপ নিষিদ্ধ হইয়াছে। চড়কের সময় বাণ ফোড়া পিঠ ফোড়া প্রভৃতি যে সকল নিষ্ঠুর কার্য্য হইত তাহাও সম্প্রতি স্থগিত হইয়াছে।

ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে পুনরায় এদেশে বিদ্যাশিক্ষার বহুল-বিস্তার হইতেছে। ইংরাজী ভাষা ও ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের বহুল শিক্ষা হইতেছে। কলিকাতা মহানগরীতে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহার অধীনে এক্ষণে এদেশে প্রেসিডেন্সি কলেজ, হুগলী কালেজ প্রভৃতি ছয়টী কলেজ আছে। চারিটী হাইস্কুল আছে। এবং প্রতি জেলাতে এক একটী জেলা স্কুল আছে। তদ্ভিন্ন অনেক স্থানে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় হইয়াছে। কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে মিশ-নরিদিগের ও এদেশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত অনেক গুলি কলেজ, হাইস্কুল ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় একটী গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত কলেজ আছে। গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য বিদ্যালয় সমূহেও সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষার বিধান করিয়াছেন। এই সকল বিদ্যালয় হইতে বিস্তর যুবক সুশিক্ষিত হইয়া বাহির হইতেছেন। ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনাবধি এপর্য্যন্ত অসংখ্য যুবক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্বে যে সকল শিনিয়র স্কলর্শিপ্-প্রাপ্ত শিক্ষিত দল বহির্গত হন, তাঁহাদের মধ্যে কতক গুলির

প্রগাঢ় বিদ্যা দেশবিখ্যাত। এক্ষণে দিন দিন যে বি এ, এম্ এর স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যেও অনেকের সারবত্তা আছে। ফলতঃ এক্ষণে দিন দিন সুশিক্ষিত দলের সংখ্যা বিশেষ বৰ্দ্ধিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয়ে ব্যবহার শাস্ত্রের উপদেশের নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। অনেক যুবক তাহাতে উপদিষ্ট হইয়া ব্যবহার শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন। এক্ষণে বি এল উপাধিধারীর সংখ্যা অগণ্য বলিলেও হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিশেষ কৃতী হইয়াছেন। বঙ্গ-যুবকেরা এক্ষণে শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক দূর অগ্রসর। তাঁহারা দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াও বারিষ্টর ও সিবিলিয়ান্ হইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি একজন যুবক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্গ্লর্ হইয়া আসিয়াছেন।

আমি এক্ষণে শিক্ষার ফল সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেছি না। সভ্য মহাশয়দিগকে তদ্বিষয়ে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।

একটী কথা বলিতে ভুলিয়া আসিয়াছি। গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে এ দেশে অনেকগুলি বঙ্গ-বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। তাহা হইতে অনেক বালক প্রতি বৎসর বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে।

বর্ত্তমান রাজ-পুরুষদিগের সময়ে বাঙ্গলা ভাষার বিলক্ষণ অনুশীলন ও উন্নতি হইতেছে। এই উন্নতির বিষয় বলিতে গেলে বঙ্গ ভাষার পূর্ব্ব অবস্থার বিষয় কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিতে হয়।

বাঙ্গলা বাঙ্গালি জাতির আদিম ভাষা নহে। অন্যান্য হিন্দু জাতির ন্যায়, বাঙ্গালিদিগেরও প্রাথমিক ভাষা সংস্কৃত। তবে অবশ্য বাঙ্গলা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? না তাহা নহে। বাঙ্গলা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হয় নাই।

সংস্কৃত ভাষার প্রচলন কালে সাধারণ লোকের ব্যবহার্য্য প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি হয়। এক সময়ে দেশ সাধারণ্যে সেই প্রাকৃত ভাষাই কথোপকথনের ভাষা হইয়াছিল। বাঙ্গলা ভাষার গঠন-প্রণালী দেখিয়া বোধ হয় সেই প্রাকৃত ভাষা হইতেই বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের লেখক পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন, " সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গলা ভাষার জননী নহেন, কিন্তু মাতামহী। " মাতাই হউন, আর মাতামহীই হউন, তিনি যে ইহার আদ্য প্রকৃতি, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু যে কেবল সংস্কৃত শব্দ দ্বারাই বাঙ্গলা ভাষা বিরচিত হইয়াছে, তাহা নহে। আদিম নিবাসীদিগের ঢেঁকী, কুলো, ধুচুনী প্রভৃতি অনেক শব্দও ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। অনেক যাবনিক শব্দও ইহাকে স্পর্শ করিয়া জাতিভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই রূপে বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।

কোন্ সময়ে বাঙ্গলা ভাষার প্রথম সৃষ্টি হয়, এক্ষণে ইহাই জিজ্ঞাস্য। উক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গলা অক্ষরের সৃষ্টি ও বাঙ্গলা ভাষার গঠন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময় বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। এই কথার পোষকতা জন্য নিম্নে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা উদ্ধৃত হইতেছে।

" সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম্ রূপ নিহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ যুড়াইতে লাখে না মিলল এক॥"

বিদ্যাপতি।

"কি মোহনী জান বন্ধু কি মোহনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি॥

ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
বন্ধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥”

চণ্ডীদাস।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এক সময়ের লোক। বঙ্গদর্শনে সপ্রমাণ হইয়াছে, যে বিদ্যাপতি চারি শত বৎসরের কিছু পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তিনি মিথিলাবাসী ছিলেন। চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ বন্ধুত্ব ছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর চৈতন্যের শিষ্য সম্প্রদায়, এবং কীর্ত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কবিগণ বিবিধ গ্রন্থ রচনা দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি-সাধন করেন। ভারতচন্দ্রের সময় বাঙ্গলার অনেক উন্নতি হয়। কিন্তু বৃটিশ অধিকারের প্রথম সময় পর্য্যন্ত গদ্য বাঙ্গলার সৃষ্টিই হয় নাই। রাজা রামমোহন রায় ও শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ গদ্য সাহিত্যে প্রথম লেখনী ধারণ করেন। মহানুভাব রামমোহন রায় সহমরণবিচার, পথ্যপ্রদান প্রভৃতি কয়েক খানি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এবং শ্রীরামপুরস্থ মিশনরীগণ গদ্য বাঙ্গলায় ধর্ম্মপুস্তক ও সমাচারদর্পণ নামে এক খানি সংবাদ পত্র প্রচার করেন। শুনিয়াছি এ বিষয়ে হিতৈষী মিশনরীগণেরই প্রাথমিক উদ্‌যোগ। তাঁহারাই প্রথমে মুদ্রাযন্ত্রের বাঙ্গলা অক্ষর নির্ম্মাণ করেন।

যদি মিশনরীগণ এদেশে আগমন না করিতেন, যদি রামমোহন রায় ইংরাজী শিক্ষা না করিতেন, কত দিনে যে এ দেশে গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তাহা বলা যাইতে পারে না। সে যাহা হউক, ক্রমে অনেক গদ্য গ্রন্থ ও সংবাদ পত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। অল্পে অল্পে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে লাগিল। বাঙ্গলা ভাষার বিশেষ উন্নতি-সাধন সমীচীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয় হইতেই সম্পাদিত হইয়াছে।

প্রথম প্রথম, সমাসবহুল দুর্ব্বোধ লম্বা লম্বা বাক্য সকল লিখিত হইত। তৎকালে, "আপনকার এ পুত্র সুলক্ষণান্বিত ও শিষ্ট শান্ত দান্ত দেখা যাইতেছেন অতএব ইঁহার নীতিশাস্ত্রবিহিত হিতাহিতোপদেশ মাত্রে নিম্নোল্লিখিতবৎ আচ্ছন্ন পূর্ব্বজর্ম্মার্জ্জিত রাজনীতি বিদ্যাতে নবমেঘশব্দেতে উদ্ভিন্ন রত্নশলাকাসমূহে বিদুর ভূমির ন্যায় বুদ্ধি সুশোভিতা হইবে।" ১। "তাহার পুত্র বীরকেশরিনামা এক দিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো বনভ্রমণজনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণীস্তনসুন্দরেন্দীবরকৈরবকোরক সুন্দরীমুখ মনোহরান্দোলিতোৎফুল্লরাজীব নির্ম্মল সুস্নিগ্ধজল পুষ্করিণীতটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবাবসান সময়ে বটজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজ ভৃত্যজন সমাজাগমন প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন।"২ "কোকিলকুলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।" ৩। এই রূপ রচনারই সমধিক গৌরব হইত। এরূপ কুরুচি, বোধ হয়, দেশের মৃত্তিকার দোষেই হইয়া থাকিবে। চতুর্ব্বিধ সংস্কৃতরচনারীতির মধ্যে গৌড়ী নামে একটি রীতি আছে। গৌড় দেশের রীতি গৌড়ী। "গৌড়ী ডম্বরবন্ধাস্যাৎ।" আড়ম্বরযুক্তা সমাসবহুলা রচনা গৌড়ী। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে সংস্কৃত রচনাতে দীর্ঘ সমাস ও অনুপ্রাসযুক্ত দেড়গজী বাক্য প্রয়োগ করা রোগ ছিল। বাঙ্গলা ভাষাতেও সে রোগ প্রথমে সংক্রামিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই সেই মন্দ রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে সরল ও সংক্ষিপ্ত বাক্যরচনার সমাদর হইয়াছে। এখন অনেক লেখকের চাঁচা ছোলা চোস্ত ভাষা হইয়াছে। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাতৃভাষার উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অনেক সংস্কৃত ভাব বাঙ্গলায় আনীত হইয়াছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও ইউরোপীয় নব নব ভাব সকল ইহাতে অনুবাদিত হইতেছে। সংস্কৃত ধাতু হইতে নূতন নূতন শব্দ সঙ্কলিত হইয়া ইহার অভাব ও ন্যূনতার পরিহার করিতেছে। ফলতঃ বাঙ্গলা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষ উন্নত, একথা স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু এখনও ইহার অনেক ত্রুটি ও বৈকল্য আছে। এখনও ইহাতে কোন কোন ভাব সহজে প্রকাশ করা যায় না। তবে আশা করা যাইতে পারে অচিরে এ ন্যূনতা নিরাকৃত হইবে। কারণ দিন দিন উহার পরিবর্ত্তন ও পুষ্টি সাধন হইতেছে।

একণে অনেক লেখকের একটী দোষ দাঁড়াইয়াছে, তাঁহারা আপনাদের ওজন রাখিতে পারেন না। কোন কোন ভাল ঘোড়াও যেমন সুন্দর যাইতে যাইতে এক এক বার আড়িয়া থাকে, সেই রূপ তাঁহারা দিব্য সরল লিখিতে লিখিতে মাঝে মাঝে উৎকট বর্ণনা করিয়া বিদ্যা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

দুঃখের বিষয় কতকগুলি লেখক বাঙ্গলা ভাষার বিশুদ্ধতা লোপ করিতেছেন। মঙ্গলের বিষয় এই যে তাঁহাদের লেখার উপর লোকের তাদৃশ গৌরব নাই।

শিক্ষিত যুবকদল মাতৃভাষার প্রতি একটি অত্যাচার করিতেছেন। তাঁহাদের কথোপকথনের ভাষা বড়ই বিকৃত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের অনেকে বাঙ্গলা কহিবার সময় প্রায় বারো আনা ইংরাজী শব্দ মিশাইয়া কহিয়া থাকেন। অধিকাংশই পরস্পর বাঙ্গলায় না লিখিয়া ইংরাজীতে পত্র লেখেন। বাঙ্গলা ভাষায় অজ্ঞতা ও অনাদরই তাহার প্রধান কারণ।

একটি কথা বলিতে ভুলিয়া আসিয়াছি। অনেক দিন হইতে গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজ সংস্থাপন করিয়া এদেশীয়দিগকে ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে উপদেশ দিতেছেন। তাহাতে অনেকে সুচিকিৎসক হইয়া বাহির হইতেছেন। অনেক ডাক্তর গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত হইয়া ও অনেকে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতেছেন। একণে দেশের প্রায় সকল স্থানেই ইউরোপীয় চিকিৎসার সাহায্য পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা দেশের মহোপকার সাধন হইতেছে। সম্প্রতি ঢাকাতে আর একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় হইয়াছে।

শিক্ষিত দলে বিজ্ঞতা ও কার্য্যদক্ষতা জন্মিয়াছে। তাঁহারা যতদূর পর্য্যন্ত রাজপদে অধিকারী হইয়াছেন, অধিকাংশ যুবক নৈপুণ্য ও

সততা সহকারে সুচারুরূপে সে সকল পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন এবং তজ্জন্য অনেকে বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেছেন। কয়েক জন শিক্ষিত মহাত্মা হাইকোর্টের জজের কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এক্ষণে বাঙ্গালি যুবকেরা যেখানে যাইতেছেন, যে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতেই বাহবা লইতেছেন। জয়পুরে বাঙ্গালির আধিপত্য হইয়াছে। কাশ্মীরেও বাঙ্গালি জাতির জয় জয়কার।

কোন কোন শিক্ষিত যুবক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া বিদ্যাবত্তা দেখাইতেছেন। কোন কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্গলা ভাষায় লেখনী ধারণ করিয়া দেশের উপকার সাধন করিতেছেন।

কোন কোন বিষয়ে যুবকদিগের চরিত্র উৎকৃষ্ট হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু বলেন, "চরিত্র বিষয়ে এ কালে তুইটী বিষয়ে উন্নতি দেখা যাইতেছে। এক উৎকোচ গ্রহণে বিরতি, আর এক স্বদেশপ্রিয়তা। সে কালে ঘুষ লওয়া একটা বড় দোষ বলিয়া গণ্য হইত না। কারণ বড় ছোট প্রায় সকল লোকেই উহাতে কিছু না কিছু লিপ্ত থাকিতেন। এখন সুশিক্ষিত দলের মধ্যে ঘুষ লওয়া বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। সে কালের লোকদিগের স্বদেশের প্রতি একটা কর্ত্তব্য বোধ ছিল না; এখন ক্রমে ক্রমে লোকের মনে সে কর্ত্তব্য বোধ জন্মিতেছে, বলিতে হইবে।"

শিক্ষা প্রভাবে জ্ঞান ও বিশ্বাস মার্জিত ও উন্নত হইতেছে। কুসংস্কার ও ভ্রম দূরীকৃত হইতেছে। সমাজ-সংস্করণে বিশেষ মনোযোগ পড়িয়াছে। বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। যদিও উহা অদ্যাপি দেশসাধারণে প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। একটী তুইটী করিয়া বিধবাবিবাহের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। তুঃখের বিষয় এই যে দেশের প্রায় সমস্ত লোকেই এবিষয়ের সমগ্রভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত আছেন।

বাল্যবিবাহ-প্রথার অল্পে অল্পে সংস্কার হইতেছে। বহু-বিবাহ নিবারণের বহু আন্দোলন চলিতেছে। বঙ্গ মহিলাগণ বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের নিকট বহু বিষয়ে উপকৃত। কারণ বহু বিবাহ-নিবারণ জন্য তাঁহারই দৃঢ় হস্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

ধর্ম্মোন্নতিসাধন হইতেছে। মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত উন্নত ও বিশুদ্ধ। এক মাত্র জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বর ব্রাহ্মদিগের উপাস্য। দিন দিন এই ধর্ম্মের উন্নতি ও বহুল প্রচার হইতেছে। এক্ষণে বহু-সংখ্যক লোক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত।

স্ত্রীশিক্ষা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটুকু বক্তব্য আছে। পড়া শুনা করিলে স্ত্রীলোকে বিধবা হয়, এ কুসংস্কার এক্ষণে প্রাচীন দল হইতেও অপসৃত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে ও দেশীয় লোকের যত্নে স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। অনেক ভদ্রলোকে বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছেন। কেহ কেহ বাটীতে শিক্ষক রাখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে যে রূপ যত্ন হওয়া উচিত, অদ্যাপি তাহা হইতেছে না। একে ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা অল্প। তাহাতে আবার বালিকারা কেবল নয় দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে গমন করিতে পায়। ইহাতে অতি সামান্যই শিক্ষা হয়। তাহার পর গৃহে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আর বিশেষ যত্ন করা হয় না। তখন তাহাদের অনেকে নিজের যত্নে যতটুকু পারে, শিক্ষা করে।

এরূপ শৈথিল্য ও অযত্ন সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ, তাহা নিতান্ত অসন্তোষকর নহে। অনেক বাঙ্গালি স্ত্রী এক রকম চলনসই লেখা পড়া শিখিয়াছে। বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পুস্তক পাঠে কোন কোন স্ত্রী লোকের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। এক্ষণে স্ত্রী-সমাজেও কুসংস্কার তিরোহিত ও ধর্ম্মভাব উন্নত হইতেছে। অনেক শিক্ষিতা স্ত্রী অফল কন্দল ও গৃহবিবাদ লইয়াই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত নহেন। এখন তাঁহারা উত্তম উত্তম পুস্তক পাঠ ও সামান্য সামান্য শিল্পকর্ম্ম করিয়া অধিকাংশ সময় যাপন করেন। দেশবিখ্যাত বামাসুন্দরী দেবী, বর্দ্ধমানের একজন শিক্ষকের স্ত্রী এবং আরও কয়েকটী ভদ্র বাঙ্গালি মহিলা

বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া স্ত্রী-সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। অনেক বঙ্গকামিনী এখন হাতা বেড়ী ছাড়িয়া কলম ধরিয়াছেন। "হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা" "উর্ব্বশী নাটক" "বামা-রচনাবলি" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ কোমলাঙ্গীদিগের কর-কমল হইতে বিনির্গত হইয়াছে। সম্প্রতি ভুবনমোহিনী দেবী নামে একটী বাঙ্গালি স্ত্রী একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতেছেন। শুনিলাম থাকমণি দাসী নামে এক বঙ্গ রমণী আজিম গঞ্জ হইতে অনাথিনী নামে পত্রিকা বাহির করিতেছেন।

বারাসাত জেলায় এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা আছেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ষাটি সত্তর বৎসর। তিনি সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্ম-পরায়ণা, তাঁহার মন অতি উন্নত ও কুসংস্কার বর্জ্জিত। তিনি একজন যথার্থ তত্ত্বদর্শিনী। তাঁহার ন্যায় দৃঢ়চিত্ততা অনেক পুরুষেও দেখা যায় না। তিনি বাল্য-কালে আপন মাতার নিকট এক পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে শিক্ষা করেন। তিনি জীবনে কখন কোন পাপকর্ম্ম করেন নাই। তিনি নিজমুখে স্বীকার করেন, একবার মাত্র একটী পাপ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক সপত্নী ছিল। বয়সকালে একবার মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামী যদি তাঁহার সপত্নীকে ভাল না বাসেন, তাহা হইলে ভাল হয়। মনে মনে সপত্নীর প্রতি এই একবার মাত্র দ্বেষভাব তাঁহার জীবনের পাপাচরণ। কেন তাঁহার মনে এমন অসদভিলাষ হইয়াছিল বলিয়া পরে তিনি অনেক অনুতাপ করিয়াছিলেন। বঙ্গভূমির গৌরব-স্বরূপ তাঁহার এক প্রগাঢ় বিদ্বান্ পুত্র অকালে প্রাণত্যাগ করিয়া সমস্ত দেশকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া যান। কিন্তু তিনি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় পুত্রশোকে নিতান্ত অভিভূত হন নাই। তিনি ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের উপর নির্ভর করিয়া আপন চিত্তকে দৃঢ় করিয়াছিলেন। অব্যবহিত পরেই তিনি কাশী গমন করেন। এবং তত্রত্য বৈদান্তিক পণ্ডিতগণের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন করিয়া মনের শান্তিলাভ করেন। একবার এই রূপ কথোপকথনের পর বাটীতে আসিয়া একজন আত্মীয়ের নিকট বলিয়াছিলেন, "আমি নিজে তত ভাবি না, দুঃখ করি না। মনকে অনেক সুস্থির করি-

য়াছি। তবে যখন বাটীর ছেলে মেয়ে সকলে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়, তখন তাহাদের দুঃখে একবার আমার মনটা কেমন করিয়া উঠে।" ইনি ঈশ্বরোপাসনা করিয়াই জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করেন। বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের সময় ইনি একটী স্বরচিত পদ্য-প্রবন্ধ কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধ অনেকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল।)

কোন কোন উন্নতিশীল যুবক বাঙ্গালী স্ত্রীদিগের স্বাধীনতাদানে ব্যগ্র হইয়াছেন। এবিষয়ে আমি একটুকু বলিতে চাই। অনেকে বলেন, স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা না থাকাতে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ও ক্লেশকর। বিদেশীয়েরা বিবেচনা করেন, আমরা স্ত্রীলোকদিগকে যেন একেবারে সিন্দুকের ভিতর চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়া তাহাদের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকি; তাহাদের একটুকুও স্বাধীনতা নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। স্ত্রীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা কি রূপ, অনেকে তাহা প্রকৃতরূপে অবগত নহে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অনেকটা স্বাধীনতা আছে। আমাদের সাংসারিক প্রায় কোন কার্য্যই তাঁহাদের অমতে সম্পাদিত হয় না। সহরে না হউক, দেশের সর্ব্বত্র পল্লীগ্রামে অনেক সময় তাঁহারা বাহিরে যাইতে পান। তাঁহারা প্রতিদিন গঙ্গায় বা পুস্করিণীতে স্নান করিতে যাইয়া থাকেন। তাঁহাদের দেবালয়ে গমন অনিবারিত। দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজা প্রভৃতি পর্ব্বে প্রতিমা দর্শনে গমন নিষিদ্ধ নহে। অনেক ভদ্রমহিলা মাহেশের রথ, খড়দার রাস, ও বীরুইয়ের দোল দেখিতে যাইয়া থাকেন। কালীঘাট, পুরুষোত্তম, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ ক্ষেত্রে অসংখ্য বঙ্গরমণীরা গমন করিয়া থাকেন। ফলতঃ বহু বিষয়ে আমাদের দেশের স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা আছে। শৃঙ্খলবদ্ধা বানরী বা পিঞ্জররুদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় তাঁহারা নিপীড়িত নহেন। তাঁহাদের অবস্থায় অনেক সচ্ছন্দতা আছে। তবে তাঁহারা বাজার করিতে যান না। এমন সকল সভায় পদার্পণ করেন না। টাউন-হলে বক্তৃতা শুনিতে যান না। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কল্পনা

দ্বারা লোকে তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা যতদূর ক্লেশকর মনে করে, তাঁহারা নিজে তাহা কিছুই বিবেচনা করেন না।

অপরিপক্কবুদ্ধি এক দল যুবক স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন, স্ত্রীলোকদিগকে পথে, ঘাটে, বাজারে বাহির করিতে পারিলেই উন্নতির একশেষ করা হইবে। আমি স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী নহি। কিন্তু আমার বিবেচনায় বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীদিগের অধিক স্বাধীনতাদান বিশেষ অনিষ্টকর হইবে। ইতিপূর্ব্বে একটী বাঙ্গালি যুবক পত্নী সঙ্গে করিয়া রেলের গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। তিনি বুঝি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যান। ঐ গাড়ীতে এক নিম্নশ্রেণীর সুরোন্মত্ত সাহেব ছিল। ঐ মাতাল সাহেব বাবুর পত্নীর সহিত করমর্দ্দন করিতে এবং অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ, গাত্রস্পর্শ প্রভৃতি অশিষ্ট ব্যবহার করিতে উদ্যত হয়। প্রথমে বাবু প্রতিবাদ করেন। কিন্তু পরে লাল মুখের ভ্রূকুটী দেখিয়া কাপুরুষ স্বামী পত্নীর নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়ান। ঐ গাড়ীতে আর একটী ভদ্র সাহেব ছিলেন। তিনি ঐ মাতাল নিকৃষ্ট সাহেবের অত্যাচার নিবারণ করেন। গার্ডকে বলিয়া তাহাকে ঐ গাড়ী হইতে নামাইয়া দেন। এবং বাঙ্গালি যুবকের নিতান্ত কাপুরুষতা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তাঁহার গালে দুই চড় কষাইয়া বলেন, "যদি রক্ষা করিতে না পারিবি, পরিবার সঙ্গে আনিস্ কেন ?" আমি একবার হাওড়া হইতে ট্রেনে যাইতেছিলাম। আমাদের গাড়ীতে এক জন ভদ্র লোক পরিবার লইয়া যাইতেছিলেন। সে গাড়ীতে অধিকাংশই মূর্খ ও সামান্য লোক ছিল। সকলে সেই ভদ্র স্ত্রীলোকটীর দিকে ক্রমাগত এমনি রূঢ় ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, যে তাহাতে, আমার বড়ই বিরক্তি বোধ হইয়াছিল। এবং সে সময় স্বজাতির প্রতি যার পর নাই ঘৃণা জন্মিয়াছিল। আমার নিকটস্থ কয়েক ব্যক্তিকে ইঙ্গিতে নিবারণ করিয়াছিলাম। সময়ে সময়ে অসহায় অবস্থায় ভদ্র কুলস্ত্রীর উপর দুষ্ট লোকদিগের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি এদেশে জাতিসাধারণে স্ত্রীজাতির প্রতি সমুচিত সমাদর করিতে শিক্ষা করে নাই। এই জন্যই আমি বলিতেছি যে এখনও আমাদের

দেশে স্ত্রীলোকদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার সময় উপস্থিত হয় নাই।

(পূর্ব্বে প্রাচীন কালের সতীত্বের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালেও এদেশে সতীত্বের সেইরূপ সমাদরই আছে। বরং স্ত্রীশিক্ষা প্রভাবে সে ভাব দৃঢ়তরই হইতেছে।

এক্ষণে যেমন জ্ঞান মার্জ্জিত হইতেছে, সেইরূপ বদান্যতা বৃত্তিও বিশুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। দেশহিতকর সাধারণ কার্য্যে লোকের দৃষ্টি-প্রবৃত্তি উন্মুখ হইয়াছে। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, আতুরনিবাস, দুর্ভিক্ষ-নিবারণ প্রভৃতি মঙ্গলকর বিষয়ে এদেশীয়দিগের বহু অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। অনেক স্থানে বারোইয়ারীর টাকা রাস্তা, ঘাট ও বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হয়।

এক্ষণে শিক্ষার আর একটী ফল হইয়াছে। এদেশে পঙ্গপালের ন্যায় অসংখ্যপ্রায় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র সকল বাহির হইতেছে। যদিও তাহার অনেক গুলিই অসার, কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি অতি সারবান্ ও সমীচীন। তদ্দ্বারা দেশের বহু উপকার সাধন হইতেছে।)

ফলতঃ এক্ষণে দেশের হাওয়া ফিরিয়া গিয়াছে। বহু বিষয়ে শুভ চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। এতাবৎকাল মধ্যে যত দূর হইয়াছে, তাহা বিশেষ উন্নতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। বঙ্গদেশ ইউরোপীয় মিশনরীদিগের নিকট বিশেষ ঋণী। তাঁহারাই এদেশে ইংরাজী-শিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। মিশনরীরাই অগ্রে বহু-সংখ্যক বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। মিশনরীদিগের মহানুভাবতা হইতেই বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি হয়। মিশনরীরাই অগ্রে বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র করেন। তাঁহারা যথার্থই এদেশের সুখে সুখ ও এ-দেশের বিপদে নিজের বিপদ মনে করেন। যখন যখন এদেশে বিপদ ও দুর্ঘটনা হইয়াছে, তখনই মিশনরীদিগের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। নীলকর-অত্যাচারে দেশ যখন উৎসন্ন হইয়া যাইতেছিল, তখন মিশনরীদিগের অন্তঃকরণ স্থির ছিল না। তখন তাঁহারা স্বজাতির দোষোদ্ঘোষণে

সঙ্কোচ করেন নাই। তখন তাঁহারা প্রখর রৌদ্রকিরণে মাঠে মাঠে ভ্রমণ করিয়া নীলকরনিপীড়িত কৃষকদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বেড়াইতেন। আমাদের চিরস্মরণীয় বন্ধু লঙ সাহেব কারাবাস স্বীকার করিয়াও এদেশের হিতসাধন-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই। আমরা এ সকল উপকার কখনই বিস্মৃত হইব না।

বহু বিষয়ে এদেশের উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও আমাদের অনেক বিষয়ে হীন অবস্থা ও অনেক অভাব আছে। অনেক বিষয়ে নূতন অবনতিও হইতেছে। এবং পূর্ব্বকার অনেক উৎকৃষ্ট বিষয়ও লোপ পাইতেছে। এক্ষণে আমি সেই সকল বিষয়ে কিছু বলিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করিব।

প্রাচীন কালে এদেশে চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষ উন্নত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে অনেক গুলি বৈদ্যক গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। সেবনীয় প্রাচীন রোগের যে সকল মহোপকারী তৈল ও ঔষধ আছে, বোধ করি, কোন দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রে অদ্যাপি সেরূপ ঔষধের সৃষ্টি হয় নাই।

দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ উন্নত চিকিৎসাশাস্ত্রের বিলোপদশা উপস্থিত। নানা কারণে দেশীয় চিকিৎসার হীন অবস্থা ঘটিয়াছে। সমস্ত চিকিৎসা-গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি না হইলে চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রবেশাধিকার হয় না। তথাপি কালক্রমে অনেক মূর্খ বৈদ্যক গ্রন্থ আঘ্রাণ মাত্র করিয়াই চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। এইরূপে দিন দিন হাতুড়ে বৈদ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আর যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে প্রতারক হইয়া উঠেন। যথাশাস্ত্র চিকিৎসা ও অকৃত্রিম ঔষধ নিতান্ত দুর্লভ হইয়া উঠে। বৈদ্যগণ আরোগ্য ও জীবন দান না করিয়া ধন প্রাণের অপহারক হইয়া উঠেন। যে সময়ে চিকিৎসার এইরূপ দুরবস্থা, সেই সময় ইউরোপীয় চিকিৎসা এদেশে উপনীত হয়। জ্বর ও অস্ত্রচিকিৎসায় ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অদ্বিতীয়। এজন্য সহজেই উহা আদৃত হইয়াছে। এক্ষণে দেশসাধারণ্যে ইউরোপীয় চিকিৎসায় আকৃষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু শীতপ্রধান দেশের উপযোগী তীব্র ঔষধ সকল এই গ্রীষ্মপ্রধান

দেশের উপযুক্ত, কি না, বিবেচনা করা উচিত। অনেকে বলেন, ইউরোপীয় উগ্র ঔষধ সকল সেবন করিয়া এদেশের লোকে দিন দিন দুর্ব্বল ও অল্পায়ুঃ হইয়া পড়িতেছে। বিশেষতঃ বহুব্যয়সাধ্য বলিয়াও ইউরোপীয় চিকিৎসা এ দেশের অনুপযোগিনী।

সুখের বিষয় এই যে, এক্ষণে পুনরায় দেশের ভদ্র লোকে বৈদ্যচিকিৎসার উপর একটু একটু অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। যদি সদ্বৈদ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যদি বৈদ্য মহাশয়েরা দেশ কালের উপযোগী করিয়া প্রাচীন চিকিৎসাপ্রণালীকে কিছু পরিবর্ত্তিত ও উন্নত করিয়া লন, অচিরে সর্ব্বসাধারণে দেশীয় চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। চিকিৎসকদিগের সমধিক শঠতা ও প্রতারণা জন্য অদ্যাপি অনেক ভদ্র লোক দেশীয় চিকিৎসার অনাদর করিয়া থাকেন। কলিকাতার কোন বিখ্যাতনামা কবিরাজ এক জনের নিকট যে তৈলের সের পঁচিশ টাকা লন, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সেই তৈলের সের পঞ্চাশ টাকা লইয়া থাকেন। বৈদ্যদিগের এ সকল দোষ পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক।

অদ্যাপি বল্লালকৃত বহু অনিষ্টকর কৌলীন্যপ্রথা নিবারিত হয় নাই। প্রথমে আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি নয়টী সদ্গুণ দেখিয়াই কুলমর্য্যাদা প্রদত্ত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা ব্যক্তিগত না হইয়া বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তদ্দ্বারা দারুণ দুর্দ্দশা ও বিস্তর অপকার হইয়া আসিতেছে। অনেক আচারভ্রষ্ট মূর্খতম ব্যক্তি বিপুল সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছে। আর দেবতাদিগেরও পূজনীয় কত ব্যক্তি জনসমাজে অবজ্ঞাত হইয়া থাকেন। কুলীন কন্যাদিগের দুরবস্থার সীমা নাই। কত সুরূপা সুশীলা কামিনী নিতান্ত অপাত্রে অর্পিত হইয়া আসিতেছে। কত স্বর্ণকান্তি ষোড়শী দন্তহীন অশীতিপর বৃদ্ধে বিসর্জ্জিত হইতেছে। কুলীনকন্যাদিগের বিবাহ নাম মাত্র। এক ব্যক্তিকে বহু কন্যা দান করা হয়। স্বামী তাহাদিগের ভরণ পোষণের দায়ী নহে। তাহারা জন্মাবচ্ছিন্নে পতিমুখসন্দর্শনে বঞ্চিত। ফলতঃ অধিকাংশ কুলীনস্ত্রী স্বামিসত্ত্বেও বিধবার অধিক যন্ত্রণা ভোগ করে।

আমাদের নিবাসগ্রামে এক প্রাতিবেশিনী কুলীনকন্যা আছে। আমি তাহার প্রকৃত নাম প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। এস্থলে তাহার নিস্তারিণী নাম রাখিলাম। নিস্তারিণী বড় দুঃখিনী। তাহার পিতা মাতা নাই। স্বামী তাহার সংবাদ লয় না। আহা! টাকুতে শণ সুতা কাটিয়া অতি কষ্টে দিন নির্ব্বাহ করে। নিস্তারিণী পরমা সুন্দরী। স্বভাব অতি ধীর ও সৎ। পাড়ার সকলে তাহাকে স্নেহ করে। অনেক সময় কেহ কেহ তাহার কিছু কিছু সাহায্য করে।

এই দুঃখিনীর এক দিনের দুঃখের কথা বলি! নিস্তারিণী সকল সময় ধোপাকে পয়সা দিয়া কাপড় কাচাইতে পারে না। মাঝে মাঝে নিজে খারে কাচিয়া লয়। এক দিন খারে সিদ্ধ করিবে বলিয়া ময়লা কাপড় গুলি রান্না ঘরে লইয়া জড় করে,—উনান ধরাইয়া জল চড়াইয়া দেয়। গরম হইলে তাহাতে কাপড় তুলিয়া দিবে, এই সময় কি প্রয়োজনে অপর গৃহে আইসে। উনানের নিকট কলাবাসনা ছিল। দৈবাৎ আগুণ লাগিয়া তাহা জ্বলিয়া উঠে। তাহাতে সমুদায় বস্ত্রগুলি ও রসুই ঘর খানী পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। সে দিন নিস্তারিণী যে কত দুঃখ করিয়াছিল, তাহার চোক দিয়া কত জল পড়িয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।

ইহার স্বামী কালীঘাটে আর এক শ্বশুর বাড়ীতে থাকে। সে ব্যক্তি নিতান্ত অক্ষম নহে। মোক্তারি না, কি করিয়া দশ টাকা উপার্জন করে।

গ্রামের এক প্রাচীনা ব্রাহ্মণী নিস্তারিণীকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। ইতি পূর্ব্বে তিনি একদিন কালীদর্শনোপলক্ষে কালীঘাটে গিয়া তাহাকে তাহার স্বামীর নিকট লইয়া যান। এবং তাহার স্বামীকে বলেন, " দ্যাখ নিস্তারিণী বড় গরিব। ওর মা বাপ নাই। ওর বড় দুঃখ। তুমি ওর স্বামী। তুমি যদি স্নেহ মমতা না করবে, তুমি যদি তত্ত্ব তাবাস না নেবে,তবে এ দাঁড়ায় কোথা ?" এই কথা শুনিয়া সেই পাষণ্ড উত্তর করে, "আমাদের অমন অনেক কাঙ্গালি আছে। আমাদের এ সব্ব দেখ্‌তে গেলে চলে না।" নিস্তারিণী এক দিন না দুই দিন সেখানে ছিল।

নিষ্ঠুর স্বামী তাহার সঙ্গে একবার বাক্যালাপও করে নাই। কি-
হ হইয়াছিল, ফিরিয়া আসিবার সময় একখানী নূতন বস্ত্র
ছিল।

নিস্তারিণীর আর একটী ভগিনী আছে। তাহারও অবস্থা ঠিক ঐরূপ। দেশের কত কুলীনকন্যা যে এই রূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেকের অবস্থা ইহা অপেক্ষাও মন্দ।

কত কুলীন কন্যার বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বিবাহই হয় না। কখন ব[illegible]ন আসন্নমৃত্যু পাত্রে উৎসর্গ করিয়া তাহাদের আইবোড়-নাম ঘুচান হয়। প্রবাদ আছে, সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে তাঁহার অন্তর্জলীর অব্যবহিত পূর্ব্বে একেবারে দশটী কন্যা সম্প্রদান করা হয়।

সুখের বিষয় এই যে এক্ষণে দিন দিন কুল-গৌরবের হ্রাস হইয়া আসিতেছে। অবিদ্বান্ কুলীন এখন আর তত আদরণীয় নহে। বর্ত্তমান সময়ে বরনির্ব্বাচন কালে বরের বিদ্যা বুদ্ধির প্রতিও দৃষ্টিপাত করা হয়।

কায়স্থদিগের মধ্যে একটী বড় অনিষ্টকর ব্যবহার আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত আছে। বরং দিন দিন তাহার অনিষ্ট-কারিতা বর্দ্ধিতই হইতেছে। কন্যার বিবাহে কায়স্থদিগের বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হয়। এক এক জন কন্যাদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। সুশিক্ষিত কায়স্থ তাঁহার পুত্রের পত্নীগ্রহণ-কালে তাঁহার ভাবী বৈবাহিকের অর্থ শোষণে সঙ্কুচিত ও লজ্জিত নহেন। বরং শিক্ষিতদলে এই অর্থলোভ অধিক-তর প্রবল দেখা যায়।

এদেশে কয়েকটী নিত্তনৈমিত্তিক কার্য্যে যে অপরিমিত অর্থরাশি অযথা ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে, অদ্যাপি তাহার হ্রাস বা নিবারণ হয় নাই।

যদিও স্ত্রীদিগের কোন কোন বিষয়ে উৎকর্ষ হইয়াছে, বটে, কিন্তু এখ-নও অনেক ত্রুটি আছে, এবং তাহাদের অনেক নূতন দোষ জন্মিয়াছে।

(শিক্ষাবিষয়ে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে অধিকাংশের রুচি বড়ই নিকৃষ্ট। অতি জঘন্য নাটক ও আখ্যায়িকা

পাঠেই অনেকের অনুরাগ। অল্প স্ত্রীলোকেই জ্ঞানগর্ভ বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পুস্তক পড়িয়া থাকেন। অনেকে কার্পেটে ফুল তুলিয়া ও মোজা বুনিয়া মনে করেন, তাঁহারা বড়ই কাজ করিতেছেন। তাই যদি আবার বেটীরা পীরান ও চাদর সেলাই করে, অনেক উপকারে আইসে। ফলত বর্ত্তমান বঙ্গ-বধূরা বড়ই অলস হইয়া উঠিয়াছেন। গৃহকার্য্যে তাঁহাদের অত্যন্ত অমনোযোগ হইয়াছে। বিশেষতঃ পাককর্ম্মে নিতান্ত অমনো-যোগিনী হইয়াছেন। বিলাতের স্ত্রীরা পূর্ব্বে পাকে অযত্ন করিয়া এক্ষণে অনুতাপ করিতেছেন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগকেও এক সময় ভয়ানক অনুতাপ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান গৃহদেবীরা বড় স্বার্থপর হইয়াছেন। তাঁহাদের নিজের অলঙ্কার ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য হইলেই হইল। স্বামীর মাতা আহার করিলেন কি না, স্বামীর ভ্রাতার শিক্ষার সুবিধা হইল কি না, সে বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই।

অদ্যাপি তাঁহাদের রীতিমত শিষ্টাচার-শিক্ষা হয় নাই। পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলে, সকলেই আপন অলঙ্কার পরিচ্ছদের ও স্বামীর পদগৌরবের প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাহাতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনে স্নেহ ও সদ্ভাব জন্মে, অদ্যাপি তাঁহারা এরূপ কথোপকথন করিতে শিখেন নাই। স্বামীদিগের এ সকল বিষয়ে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান বঙ্গীয় কুল-বধূদিগের পরিচ্ছদ বড়ই জঘন্য! প্রাচীনারা মোটা মোটা শাড়ী পরিতেন। নবীনা লক্ষ্মীরা ক্রেপ, নীলাম্বরী, শান্তিপুরে, কলমে প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া নির্লজ্জতার একশেষ প্রকাশ করিতেছেন। ঐ কাপড় পরিয়া, বাহিরের কথা দূরে থাকুক, বাড়ীর ভিতর আত্মীয় স্বজনের নিকট আসিলে, তাঁহাদিগকে লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয়। এই পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। আমি ঘাঘরা গাউন পরাইতে বলিতেছি না। পুরু পুরু শাড়ী পরাইলেই হয়। সরু কাপড় আদপে দিব না এই প্রতিজ্ঞা করিলেই হইল। কিন্তু বোধ করি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে অনেক স্বামীর সাহস হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা-প্রভাবে বঙ্গসমাজে দিন দিন একটী ক্ষুদ্র বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া উঠিতেছে। প্রাচীন কাল হইতে এক এক শ্রেণী বা জাতির উপর এক একটী ব্যবসায় নির্দ্ধারিত আছে। কিন্তু এক্ষণে শিক্ষাপ্রণালীর ঔদার্য্যগুণে নিম্নশ্রেণীর অনেকে আপনাদের অবস্থা উন্নত করিয়া তুলিতেছে। কোন কোন ব্যবসায়ে কুসংস্কার বা অপকর্ষবশতঃ অন্যে প্রবৃত্ত হইতেছে না। অথচ তত্তদ্‌ব্যবসায়ীর সংখ্যা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। এজন্য সমাজে সেই সেই বিষয়ে অসুবিধা হইয়া উঠিতেছে। এখন কোন কোন যুবক সক্ করিয়া দাঢ়ী রাখিতেছেন। কিন্তু শীঘ্রই সকলকে বাধ্য হইয়া দাঢ়ী রাখিতে হইবে। কারণ, অনেকেই খুর ছাড়িয়া পেন্ ধরিয়াছে। একটী কেরাণীর কর্ম্ম খালী হউক, এক শ খান দরখাস্ত পড়িবে। কিন্তু এক জন সূত্রধর অন্বেষণ কর, কদাচ সহজে পাইবে না। কারণ অনেকের হাতে রেঁদার পরিবর্ত্তে পুস্তক পড়িয়াছে। এক্ষণে চাসার ছেলেরাও লেখা পড়া শিখিতেছে। কিন্তু অনেক কৃষক ক্ষোভ করে, এখন আর তাহাদের ছেলেরা তাহাদের চাষের কাজে সাহায্য করিতে চায় না। নিম্ন শ্রেণীর উন্নতিতে কেহই অসুখী নহে। কিন্তু জনসমাজের অসুবিধারও প্রতিবিধান আবশ্যক। যদি লেখা পড়া শিখিয়া আপন আপন ব্যবসায়ের উন্নতি করে, সকল পক্ষেই মঙ্গল হয়। তাহা না করিয়া বুট পিরাণ পরিবে। বাবু সাজিবে। সহস্র কষ্ট পাইলেও জাতীয় ব্যবসায়ে হাত দিবে না। কেবল চাকরী খুঁজিয়া বেড়াইবে। এই সহরে এক জন সূত্রধর ছিল। জাতীয় ব্যবসায় করিয়া স্বচ্ছন্দে স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণ করিত। সম্প্রতি সে ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পুত্র কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখা পড়া করিয়াছে। স্বজাতিব্যবসায় শিখে নাই। এখন চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। যার পর নাই কষ্ট হইয়াছে। যদি লেখা পড়ার সঙ্গে স্বব্যবসায় শিক্ষা করিত, আজ অক্লেশে দশ টাকা উপার্জন করিতে পারিত। আশা করা যায়, প্রাইমেরী এজুকেশন অর্থাৎ প্রথম শিক্ষা দ্বারা দেশের এ অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

শিক্ষিত যুবকদিগের চরিত্র যেমন কোন কোন বিষয়ে উৎকৃষ্ট হই-

য়াছে, তেমনি কয়েকটী বিষয়ে অপকৃষ্টও হইয়াছে। এখনকার যুবকেরা অবিনীত। গুরুতর ব্যক্তির প্রতি সমুচিত সম্মান করেন না। কোন কোন যুবক পিতৃবন্ধুকে তুমি তুমি বলিয়া সম্ভাষণ করেন। রাজনারায়ণ বাবু 'সেকাল আর একাল' পুস্তকে বলেন, "চরিত্র বিষয়ে বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের আর এক অবনতির চিহ্ন, যুবকদিগের অশিষ্ট ব্যবহার। সেকালে যেমন প্রবীণ ব্যক্তির সম্মান ছিল, যেমন প্রত্যেক পাড়ায় একজন করিয়া কর্ত্তা থাকিতেন, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত, সকলেই তাঁহার বশম্বদ থাকিত, সেরূপ ভাব এখন দৃষ্ট হয় না। এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহাকে মানে না, কেহ কাহার তোয়াক্কা রাখে না। স্বাধীনতার ভাব ভাল ভাব, কিন্তু বয়সের প্রতি, বিজ্ঞতার প্রতি উপযুক্ত সম্মান করা কর্ত্তব্য। ঔদ্ধত্যের ভাব কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না।"

তিনি আর একস্থানে বলেন, "চরিত্র বিষয়ে দেশস্থ লোকের অবনতির কারণ তাহাদিগের ধর্ম্মবিষয়ে অবনতি। ধর্ম্মের প্রধান উপাদান ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও পরকালের ভয়। সে কালের লোকের বিশ্বাস যেরূপ থাকুক না কেন, ঈশ্বরের প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ও পরকালের ভয় ছিল। এক্ষণকার লোকদিগের সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বিদ্যানুশীলনের প্রাদুর্ভাব বশতঃ ধর্ম্মবিষয়ে সত্য জ্ঞান প্রচারিত হইতেছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মের প্রধান উপাদান শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পরকালের ভয়, সে সকল তিরোহিত হইতেছে।"

শিক্ষিত দলে সুরা প্রবেশ করিয়া দেশের বহু অপকার করিতেছে। অনেকে পানে ও তাহার আনুষঙ্গিক আমোদে ব্যাপৃত থাকিয়া নিজের ও দেশের উন্নতিসাধনের অবসর পান না। কত লোকে পানদোষ বশতঃ চিররুগ্ন ও একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়াছেন। দেশের অলঙ্কার স্বরূপ কয়েক ব্যক্তি সুরাগরল পান করিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ফলতঃ মদ্যপানে যে বঙ্গদেশের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ইউরোপীয়দিগের আর আর মহদ্‌গুণ ত্যাগ করিয়া কেবল এক পানদোষের অনুকরণ করিব! সুখের বিষয় এই যে, এক্ষণে যে সকল শিক্ষিত দল বাহির হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে

অনেকেই এদোষে লিপ্ত নহেন। ইহা কেবল অধ্যাপক বাবু প্যারীচরণ সরকারের যত্ন ও পরিশ্রমের ফল।

রাজনারায়ণ বাবু আর একস্থানে লিখিয়াছেন "এক্ষণকার লোকেরা পূর্ব্বকার লোক অপেক্ষা অধিক অসরল। এখন পদে পদে খলতা, অসরলতা। এখন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া শীঘ্র বুঝিবার যো নাই যে তাহার মনের ভাব কি? এখন বাহিরে "আসিতে আজ্ঞা হউক," "ভাল আছেন" "মহাশয়" ইত্যাদি দাঁত বাহির করা সভ্যতা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পরস্পর এমনি কৌশল চলিতেছে যে, তুমি যদি "বেড়াও ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়।" এক্ষণে ছদ্মব্যবহার অতিশয় প্রবল। এবিষয়ে বহরমপুরনিবাসী সুকবি রামদাস সেন এক্ষণকার লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খুব সত্য।

"কতভাবে ভ্রম তুমি কত সাজ পর।
বঙ্গরঙ্গ আগারেতে অভিনয় কর॥
দেশের হিতের জন্য করি প্রাণপণ।
এখানে সেখানে ফের মহা ব্যস্ত মন॥
পীযূষবর্ষণ মুখে হৃদে ক্ষুরধার।
মরি কি বঙ্গের সুত চরিত্র তোমার!॥"

রাজনারায়ণ বাবু বিলাতের ফেরত যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "যাঁহারা এক্ষণে বিলাত হইতে ফিরিয়া আইসেন হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে লোকশানের খাতায় লিখিতে বাধ্য হয়েন। বাবু বিলাত হইতে সাহেব সাজিয়া ফিরিয়া আসিলেন, না কাহারো সঙ্গে পোশাকে মিলে, না কাহারো সঙ্গে ব্যবহারে মিলে। কোথায় তাঁহারা যে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া আইলেন, সেই জ্ঞানালোকে স্বদেশীয়দিগকে বিভূষিত করিবেন, না একেবারে সমাজছাড়া হয়ে বস্‌লেন।"

বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ কতকগুলি অপকর্ষভাব প্রবল হইয়াছে। বিশেষরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া ঐ গুলির সংশোধন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এখনকার লোকে দিন দিন বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে প্রতিগ্রামে প্রতিপল্লীতে কুস্তির আখড়া ছিল, তদ্ভিন্ন শারীরিক পরি-

শ্রমের অনেকপ্রকার ক্রীড়া ছিল। এখন সে সকল লোপ পাইয়াছে। এখন শৈশব হইতেই কেবল মানসিক শ্রম। এই কারণে লোকে ক্রমশঃ বলহীন হইয়া পড়িতেছে। এ সংসারে অনেক সময় শারীরিক বলের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে। সহস্র বিদ্যাবুদ্ধি সত্ত্বেও বলবীর্য্যহীন জাতি একটা জাতির মধ্যেই গণ্য নহে।

আহারের স্বল্পতা বর্ত্তমান দৌর্ব্বল্যের এক প্রধান কারণ। পূর্ব্বকার লোকের আহার অনেক অধিক ছিল। আমাদের গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ এক দিন রাত্রিতে নিয়মিত আহারের পর বাজি রাখিয়া একটী পেটো ইলিশ মাছের ঝোল ও এক কাঠা অর্থাৎ একসের এগারো ছটাক চাউ-লের অন্ন খাইয়াছিলেন। একবার এখানকার কোন ভদ্র লোকের বাটীতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স বিরাশী বৎসর। বৃদ্ধ স্বহস্তে দুইসের ময়দার লুচি ভাজিয়া লন। সেই সমস্ত লুচি ও তাহার সঙ্গে সের দেড়েক গুড় ও দেড় সের সন্দেশ ভক্ষণ করেন। এত বয়স হই-য়াছে, তথাপি প্রতিদিন পনেরো ষোল ক্রোশ পথ চলিতে পারেন। শুনিয়াছি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্বশুর প্রতিদিন বারো সের দুগ্ধ পান করিতেন। এইরূপ প্রাচীন দলের লোকদিগের আহারের পরিমাণ অনেক অধিক।

কিন্তু এখন বাবুদিগের আহার অতি সূক্ষ্ম হইয়া পড়িয়াছে। অধি-কাংশ বাবুর এইরূপ আহার দাঁড়াইয়াছে। আধপোয়া জোর তিন ছটাক সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন। একটু মুগের ডাইল। দুই খানি না হয় চারি খানি পটল ভাজা। একটু মৌরলা মাচের ঝোল। কিঞ্চিৎ দুগ্ধ। ইহাতেও গরম হইবার ভয়ে মুগের ডাইলে লেবুর রস দেওয়া হয়। এত সূক্ষ্ম আহারেও কখন কখন বাবুর পেট ফাঁপে। জীর্ণ হয় না। যদি এক জন প্রাচীন কালের লোককে এইরূপ সূক্ষ্ম আহার করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে হয় ত, ঐ প্রাচীন ব্যক্তি কৌতুক বরিবার নিমিত্ত, মুগের ডাইলে ফোঁটা কাটিয়া পটল ভাজা দুই খানি কাণে গুঁজিয়া ধ্যানাসক্তের ভাণ করিতে পারেন। এখন কোন কোন বাবু মাখনের কলিজা আহার করিয়া থাকেন। খোসা ছাড়াইয়া সন্দেশ খাইবার কথাও শুনিতে

পাওয়া যায়। পুষ্টিকর আহারের বিধান করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

বলবৃদ্ধির জন্য আমাদের বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় এই যে কোন কোন গবর্ণমেণ্টবিদ্যালয়ে ব্যায়ামশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এবিষয়ে বাবু নবগোপাল মিত্রকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত। তাঁহারই যত্নে সর্ব্বাগ্রে কলিকাতায় একটী স্বাধীন ব্যায়ামশিক্ষালয় হই-য়াছে। কিন্তু এতাবন্মাত্র পর্য্যাপ্ত নহে। এবিষয়ে বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক।

এ দেশের একটী প্রধান দোষ এই যে, শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকেই বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া লেখা পড়ায় জলাঞ্জলি দেন। অনেক যুবক নভেল পাঠ করিয়াই বিদ্যাচর্চ্চার অভিমান করেন। অল্প লোকেই সমীচীন বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা করিয়া থাকেন। ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার কয়েক বৎসর হইল একটী উচ্চতর বিজ্ঞানসভা-সংস্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তজ্জন্য যন্ত্রাদি ক্রয়ের নিমিত্ত যে অর্থ আবশ্যক, তিনি হিতৈষী দেশীয় লোকের নিকট তাহা প্রার্থনা করিতেছেন। তজ্জন্য লক্ষ টাকা আবশ্যক। অনেকে তাহাতে দান করিতেছেন বটে, কিন্তু অদ্যাপি লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হয় নাই। এই এত বড় মেদিনীপুর জেলা, আজ পর্য্যন্ত তাহাতে এখান হইতে কেহ সাহায্য প্রেরণ করেন নাই। কেবল বাবু বিপিনবিহারী দত্ত সে দিন পাঁচ শত টাকা দান করিয়া মেদিনীপুরের কথঞ্চিৎ মুখরক্ষা করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই দেশের বিজ্ঞানানুরাগ যত, তাহা জানা যাইতেছে।

দেশের লোকে সুশিক্ষিত হইতেছেন বটে, কিন্তু প্রায় সকলেই এ পর্য্যন্ত চাকরীভক্ত হইয়া আছেন। ডাক্তর, উকীল প্রভৃতি কতকগুলি লোকে কেবল এক্ষণে স্বাধীন বৃত্তিতে অনুরক্ত। তদ্ভিন্ন প্রায় সকলেই চাকরীর জন্য লালায়িত। বড় বড় উপাধিধারীরা অতি সামান্য বেতনে সামান্য পদে নিযুক্ত হইবেন, তথাপি গৌরবকর কোন স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন না।

শিক্ষিত ব্যক্তির হস্ত স্পর্শ না থাকাতে এ দেশের কৃষি বাণিজ্যাদির এত হীন অবস্থা।

নানা কারণে এক্ষণে এদেশে শস্য অসুলভ ও বহুমূল্য হইয়াছে। এখন কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অশিক্ষিত সামান্য লোকের হস্তে থাকাতে অদ্যাপি কৃষিকার্য্য ও তাহার যন্ত্র সকল নিতান্ত নিকৃষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে। সেই মান্ধাতার সময়ে যে লাঙ্গল ও কোদাল ব্যবহৃত হইত, আজও তাহাই আছে। সম্ভ্রান্ত লোকের পক্ষে ক্ষেত্রকর্ষণ অপমান-জনক বলিয়া প্রাচীন দলের কুসংস্কার আছে। কিন্তু ইউরোপে কত সুশিক্ষিত লোকে আগ্রহ সহকারে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। বড় আহ্লাদের বিষয় যে শ্রীনাথ দত্ত নামে এক জন যুবক স্কটলণ্ডে রীতিমত কৃষি বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছেন। তিনি ত্বরায় প্রত্যাগমন করিয়া দেশের কৃষি কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন। শুনিলাম চট্টগ্রাম হইতে আর এক যুবক এই অভিপ্রায়ে স্কটলণ্ডে যাইতেছেন। অবশ্য আশা করা যাইতে পারে, ইঁহাদের দ্বারা কৃষিকার্য্যের বিস্তর উন্নতিসাধন হইবে। এই রূপ কতকগুলি যুবক প্রবৃত্ত হইলে উন্নতির পথ কে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে?

অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকের আয়ত্ত থাকাতে বাণিজ্যের অবস্থাও বড় মন্দ। মিলিত বাণিজ্যের প্রথা প্রবর্ত্তিত না হওয়াতে তাহা এপর্য্যন্ত সঙ্কীর্ণ অবস্থায় আছে। যে দিন যুবকদল মিলিত হইয়া বিস্তৃত বাণিজ্য আরম্ভ করিবেন, যে দিন তাঁহাদের বাণিজ্যপোত দূরদেশে গমন করিবে, সেই দিনই দেশের যথার্থ মঙ্গল হইবে। সিবিলিয়ান, বারিষ্টর হইবার জন্য যুবকদিগের জাহাজে আরোহণসংবাদ তত সুখকর নহে। যে দিন শুনা যাইবে, বঙ্গযুবক পোতাধক্ষ্য হইয়া বাণিজ্যার্থ ইউরোপে গমন করিতেছেন, সেই দিনই যথার্থ আনন্দের দিন হইবে।

বাঙ্গালী যুবকেরা অদ্যাপি ইউরোপীয় শিল্প ও যন্ত্র-বিদ্যা-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন নাই। শতাধিক বৎসর আমাদের ইংরাজ রাজ্যে বাস। তথাপি কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তি পোতনির্ম্মাণে বা পোতচালনে শিক্ষিত হইলেন? কয় ব্যক্তি রেইলওয়েট্রেণ চালাইতে শিখিয়াছে? বঙ্গীয় যুবকেরা অদ্যাপি বস্ত্রের কল বসাইতে বা চালাইতে সক্ষম হইলেন না। সভ্য দেশে এখন প্রায় সকল প্রয়োজনীয় বস্তুই যন্ত্র-প্রসূত। সে সকল

বস্ত্র অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এদেশে আসিতেছে। হস্তপরিশ্রম যন্ত্র পরিশ্রমের সহিত কখনই প্রতিযোগিতা করিতে পারে না! এ জন্য এ দেশের তন্তুবায়দল নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শুনিতে পাই বিলাতে নাকি কল্‌কে হাঁড়ীর নমুনা গিয়াছে! কোন্ দিন বিলাতী হাঁড়ী আসিয়া দেশীয় কুমারদিগের হাঁড়ী মারিবে দেখিতেছি। আশু ইউরোপীয় যন্ত্রাদি নিয়োজিত না হইলে, এখানকার শ্রমজীবিদল উৎসন্ন হইয়া যাইবে। ইহা আমাদের অল্প লজ্জার বিষয় নহে, যে এখান হইতে তুলা ম্যাঞ্চেষ্টরে যাইয়া বস্ত্র হইয়া আসিলে, আমাদের পরিধেয় বস্ত্র হইবে। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য হাঁড়ীর জন্য এ দেশ হইতে বিলাতে জাহাজ জাহাজ কাদা না গেলে বাঁচি। এ বিষয়ে বোম্বাইবাসীদিগকে বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। তাহারা বিবিধ শিল্পযন্ত্র করিয়া অন্যান্য সভ্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বড় স্থখের বিষয় যে বাবু ঋষিবর মুখোপাধ্যায় ইউরোপে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে গমন করিয়াছেন।

যেরূপ চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা করা যাইতে পারে, কালে আমাদের এ সকল অভাবের পূরণ হইবে। আমাদের অবস্থা কিরূপ, এক্ষণে তাহা আমাদের অনুধাবন করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান অবস্থায় পরিতৃপ্ত থাকা উচিত নহে। দেশের সজীবতা সম্পাদন করিতে হইবে। এখন উনবিংশ শতাব্দী। এ সময় চারি দিকে উন্নত সভ্যতা। আজও কি আমরা অর্দ্ধসভ্য বলিয়া পরিচিত হইব? যাহাতে আমাদের এ পরিচয় আর না থাকে, তাহা করিতেই হইবে। পরিশ্রম ও যত্ন কর, জগদীশ্বরের উপর নির্ভর কর; অবশ্যই আশা পূর্ণ হইবে।

সম্পূর্ণ।